ইস্‌লাম-চিত্র ও সমাজ-চিত্র।

মক্কা-শরীফের ও মদিনা শরীফের ইতিহাস, আদর্শ-রমণী,
জেরুসালমের ইতিহাস, হজরতের জীবনী, নূরজাহান বেগম,
ইস্‌লামসঙ্গীত ও সপ্নবিচার প্রণেতা—

মৌলভী শেখ আবদুল জব্বার সম্পাদিত।

পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ।

PUBLISHED BY THE AUTHOR.
Gaffargaon, Mymensingh.

PRINTED BY S. A. GUNNY
at the Alexandra S. M. Press, Dacca.

মূল্য ।৶০ আনা] [চৈত্র—১৩১০ ।

হিন্দু ও মুসলমান সংবাদপত্রসমূহ
ও
পণ্ডিতমণ্ডলী কর্তৃক
উচ্চপ্রশংশিত, বিখ্যাত পারিজাত-প্রণেতা,
শেখ হবিবর রহমান সাহেবের

আবে-হায়াত

ছন্দে ও স্বর্গীয় ভাবে বাঙ্গালা সাহিত্য জগতে
যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে।

পুস্তকখানি পাঠকমাত্রেরই নবজীবন আনয়ন করিবে।

বহুপূর্ব্বে একদিন হাফেজ, রূমী প্রভৃতি মহর্ষিগণ
জগৎবাসীকে যে স্বর্গীয় গীতে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন,
এই বিংশ শতাব্দীতে আবার সেই গীতের
উৎস উৎসারিত হইল।

কবিবরের "পারিজাত" গ্রন্থের
অসংখ্য অযাচিত প্রশংসাপত্রের মধ্যে কয়েকখানির
দুই এক ছত্র মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

১। সুপ্রভাতঃ—অনেকগুলি কবিতাই আমাদিগকে যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দ দান করিয়াছে।

২। হাললুল-মাতিনঃ—ইহার "পারিজাত" নাম সার্থক। "পারিজাত" পারিজাতবৎ সুষমামণ্ডিত, স্নিগ্ধ অক্ষয় মন-প্রাণ-উন্মাদকারী সৌরভময়।

পারিজাত মূল্য ॥•, আবে হায়াত মূল্য ।৵• আনা।

উৎসর্গ।

বিদ্যোৎসাহী

মদীয় চির হিতচিকির্ষু

দাতা, দয়ালু ও বিনয় সৌজন্যে মহাপুরুষ

মৌলভী মোহাম্মদ মেহরাব আলী চৌধুরী

দিনাজপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার সাহেবের হস্তে

এই

ইস্‌লাম-চিত্র ও সমাজ-চিত্র

সাদরে অর্পিত হইল।

সূচীপত্র।

ইস্‌লাম-চিত্র।

সমাজ-চিত্র।

ইস্‌লাম-চিত্র ও সমাজ-চিত্র।

মক্কা-শরীফের ও মদিনা শরীফের ইতিহাস, আদর্শ-রমণী,
জেরু সালমের ইতিহাস, হজরতের জীবনী, নূরজাহান বেগম,
ইস্‌লামসঙ্গীত ও সপ্নবিচার প্রণেতা—

মৌলভী শেখ আবদুল জব্বার সম্পাদিত।

পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ।

PUBLISHED BY THE AUTHOR.
Gaffargaon, Mymensingh.

PRINTED BY S. A. GUNNY
at the Alexandra S. M. Press, Dacca.

মূল্য ।৵০ আনা]　　　[চৈত্র—১৩২০।

হিন্দু ও মুসলমান সংবাদপত্রসমূহ

ও

:পণ্ডিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক

উচ্চপ্রশংশিত, বিখ্যাত পারিজাত-প্রণেতা,

শেখ হবিবর রহমান সাহেবের

আবে-হায়াত

ছন্দে ও স্বর্গীয় ভাবে বাঙ্গালা সাহিত্য জগতে

যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে।

পুস্তকখানি পাঠকমাত্রেরই নবজীবন আনয়ন করিবে।

বহুপূর্ব্বে একদিন হাফেজ, রূমী প্রভৃতি মহর্ষিগণ

জগৎবাসীকে যে স্বর্গীয় গীতে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন,

এই বিংশ শতাব্দীতে আবার সেই গীতের

উৎস উৎসারিত হইল।

কবিবরের "পারিজাত" গ্রন্থের

অসংখ্য অযাচিত প্রশংসাপত্রের মধ্যে কয়েকখানির

দুই এক ছত্র মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

১। সুপ্রভাতঃ—অনেকগুলি কবিতাই আমাদিগকে যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দ দান করিয়াছে।

২। হাললুল-মাতিনঃ—ইহার "পারিজাত" নাম সার্থক। "পারিজাত" পারিজাতবৎ সুষমামণ্ডিত, স্নিগ্ধ অক্ষয় মন-প্রাণ-উন্মাদকারী সৌরভময়।

পারিজাত মূল্য ॥৹, আবে হায়াত মূল্য ।৵৹ আনা।

উৎসর্গ।

বিদ্যোৎসাহী

মদীয় চির হিতচিকির্ষু

দাতা, দয়ালু ও বিনয় সৌজন্যে মহাপুরুষ

মৌলভী মোহাম্মদ মেহরাব আলী চৌধুরী

দিনাজপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার সাহেবের হস্তে

এই

ইস্‌লাম-চিত্র ও সমাজ-চিত্র

সাদরে অর্পিত হইল।

প্রাইজ ও উপহারের অভিনব গ্রন্থ।

প্রসিদ্ধ যশস্বী ঐতিহাসিক

মৌলভী শেখ আবদুল জব্বার সাহেব লিখিত

হজরতের জীবনী।

তিন রঙ্গের বহু চিত্রে পরিশোভিত।

এমন মনোহারিণী ভাষায়, এমন অভিনব সাজে ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠাতার সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর জীবনী এই নূতন। বিলাতী এণ্টিক কাগজে লাল ও ব্লু কালিতে দুই রঙ্গে মনোহর ছাপা, নয়ন-মন-মুগ্ধকর সিল্কের কাপড়ে বিলাতী বাঁধাই; সোণার জলে চক্‌চকে নাম লেখা। এমন উজ্জ্বল চরিত্র মাধুর্য্য, এমন চিত্তাকর্ষক জীবনী গ্রন্থ বঙ্গভাষায় নিতান্তই দুর্ল্লভ। ভাষা সরল ও মধুর। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

নুরজাহান বেগম।

ভারত সম্রাট্ জাহাঁগীর ও সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের যুগলমূর্ত্তি

চারি রঙ্গে সোণালী মণ্ডিত।

সুললিত মধুর ভাষায় লিখিত; বর্ডার দিয়া দুই রঙ্গের কালিতে বিলাতী এণ্টিক কাগজে মোহনবেশে, মনোহর সাজে সুসজ্জিত। বহু রঙ্গের সুচারু চিত্তবিনোদন মলাট দেখিলে আনন্দে আত্মহারা হইবে, চোখ দুইটি পলকহীন হইবে। এমন চিত্ততোষিণী বই আজ পর্য্যন্ত বাজারে বাহির হয় নাই। অথচ মূল্য অতি সামান্য ৷৷৹ আনা, বাঁধাই ৸৹ আনা।

সূচীপত্র।

ইস্‌লাম-চিত্র।

সমাজ-চিত্র।

ইস্‌লাম-চিত্র।

প্রার্থনা।

(১)

নিষ্কলঙ্ক, সচ্চরিত্র, নির্ম্মল-হৃদয়,
ছিল যবে জগতের মোস্লেম নিচয় ;—
যে দিন করিত পরে পর-উপকার,
সে দিন ফিরিয়া পুনঃ আসিবে কি আর ?

(২)

পুণ্য কর্ম্মে ছিল যবে সকলের মন,
ছিল লোক সত্যবাদী ধর্ম্মপরায়ণ ;—
যে দিন ছিল না দেশে দুঃখ-হাহাকার,
সে দিন ফিরিয়া পুনঃ আসিবে কি আর ?

(৩)

বার্ত্তাবহ "নবী" মুখে শ্রবণে কোরান,
ভক্তি-রসে গলে যে'ত সকলের প্রাণ ;—
ছিল যবে শান্তিপূর্ণ সুখের সংসার,
সে দিন ফিরিয়া পুনঃ আসিবে কি আর ?

(৪)

"অলী-আল্লা" সাধু সনে ছিল সদালাপ,
জানিত না সে সময়ে কারে বলে পাপ ;—
যে দিন ইস্লাম ছিল বরেণ্য সবার,
সে দিন ফিরিয়া কি গো আসিবে না আর ?

(৫)

লক্ষ লক্ষ বীর দক্ষ ইস্লাম রক্ষণে,
অরপিত হর্ষে শির ভীম রণাঙ্গনে ;
বাড়ী ঘর ছাড়ি কত শত জন আর,
দূরদেশে গিয়া ধর্ম্ম করিত প্রচার,
সে দিন ফিরিয়া পুনঃ আসিবে কি আর ?

(৬)

ইস্লাম মুক্তির পথ জেনে সর্ব্বজন,
করিত যখন সুখে মস্‌জেদে গমন ;—
ছিল যবে সব মুখে "আল্লাহু আক্‌বার",
সে দিন ফিরিয়া কি গো আসিবে না আর ?

(৭)

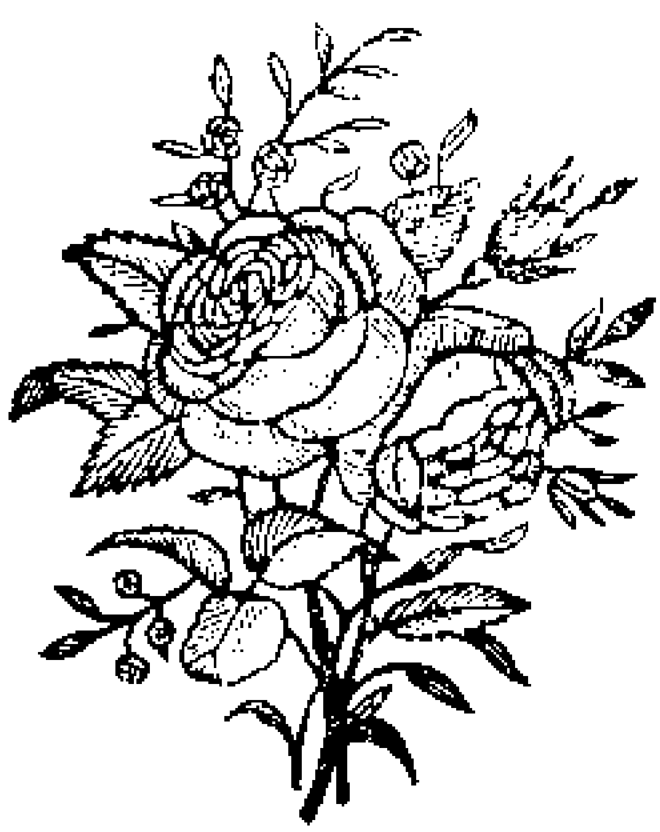
যে দিন মোস্লেমগণ বসি' ধর্ম্মালয়ে,
পড়িতা কোরান অহো সভক্তি হৃদয়ে,
প্রতিবাসী ফুল্লচিতে যে'ত শুনিবার,

(৮)

যে দিন মোস্লেম সব আনন্দে মাতিয়া,
দিকে দিকে ধর্ম্ম জ্যোতিঃ দিতা বিস্তারিয়া,—
ইস্লামে দীক্ষিত হত ভিন্ন জাতি আর,
সে দিন ফিরিয়া কি গো আসিবে আবার ?

(৯)

যে দিন মোস্লেম ছিল সবের প্রধান,
যে দিন মোস্লেম গৃহে ছিল ধন মান ;—
ইস্লাম-মহিমা-গীত হ'ত অনিবার,
সে দিন ফিরিয়া পুনঃ আসিবে কি আর ?



স্বর্গীয় মহাগ্রন্থ কোরান-শরীফ।

কোরান শব্দ উচ্চারিত হইলে এ বিশ্ববাসী সনাতন ইস্‌লামাবলম্বী নর-নারিগণের মানস-সাগরে এক অভূতপূর্ব্ব ভক্তি-লহরী উত্থিত হয়। অনন্ত জ্ঞান-রত্নের ভাণ্ডার, অখিল ধর্ম্মের মূলাধার পবিত্র মহাগ্রন্থ কোরান-শরীফই মোস্লেমবৃন্দের হৃদয়ের বস্তু ও প্রাণাধিক প্রিয়তম পদার্থ। পবিত্র কোরানের মূল-তত্ত্ব সমূহ বিবিধ ভাবে বিবিধ ছন্দোবন্ধে স্বর্গীয় অমৃত তেজে আরব্য ভাষায় নিবদ্ধ হইয়া দিব্য সৌন্দর্য্যে বিভূষিত রহিয়াছে।

এই স্বর্গীয় শোভায় পরিশোভিত—ফল, পুষ্প, শাখা-পল্লব পরিভূষিত অপরূপ পরম পবিত্র কোরান-শরীফ কল্পতরুর সমীপে যিনি যে উদ্দেশ্যে (অবশ্য সৎ উদ্দেশ্যে) যে ভাবে গমন করিয়া যে ফলের আকাঙ্ক্ষী হইয়াছেন, তিনি স্বীয় শক্তি অনুরূপ সেই প্রকার অমৃতময় ফল গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়া কৃতার্থ ও ধন্য হইয়াছেন।

কোরান শব্দ রসনায় উচ্চারিত হইলে, অথবা শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট হইলে, কিম্বা হৃদয়রাজ্যে বা স্মরণপথে সমুদিত হইলে, কি এক অনির্ব্বচনীয় ভক্তি, অপরিসীম প্রীতি, অচিন্তনীয় শান্তির সহিত অভাবনীয় ভীতির সঞ্চার হয়—তাহা মহাভাবুকের লেখনীও বর্ণনা করিতে অক্ষম।

এই রত্নাকরে কত জ্ঞান-রত্ন কত স্থানে নিবিড় স্বচ্ছ-সলিল-রাশির মধ্যে কি অবস্থায় নিহিত রহিয়াছে, তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করিতে যাওয়া অসম্ভব। এই সুগভীর পবিত্র মহাসিন্ধুর সৌন্দর্য্য দর্শন করত এবং তাহাতে মহারত্ন নিহিত আছে জানিয়া অনেকে তাঁহার সন্নিকটে সমাগত হন বটে, কিন্তু হয়ত কেবল জল পান করিয়াই পরিতৃপ্তি লাভে বিরত হইতে বাধ্য হন। পরিতৃপ্তির কারণ, এ জল লবণাক্ত নহে—ইহা ঈশ্বরদত্ত অমৃতপূর্ণ ক্ষীর-ধারা।

আবার—কখন কখন কেহ কেহ সাহসে নির্ভর করিয়া জল মধ্যে অবতরণ করেন, কিন্তু ভীষণ জলজন্তুগণের উৎপাতে তাঁহারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পলায়নে তৎপর হন। কেহ কেহ সুদূর হইতে অতল অসীম জলরাশির অতি ক্রোধ-কোলাহল, ভয়ঙ্কর কল্লোলনিনাদ শ্রবণে নিবৃত্ত হন। এই রত্নাকর গর্ভস্থিত রত্ন সমূহ লাভ করা অত্যন্ত সৌভাগ্য ও অতি সুকৃতির বিষয়। কিন্তু পুণ্যশীল সাধু-চরিত্র অটল বিশ্বাসী, শ্রদ্ধালু হৃদয়বান্ ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কে সেই রত্ন লাভের অধিকারী হইতে পারে?

স্বর্গীয় মহাগ্রন্থ কোরান-শরীফই ইস্লামধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিসমূহের সর্ব্ববিধ জ্ঞান ও ধর্ম্মের মূলাধার। ইহা হইতে আধুনিক সময় পৃথিবী প্রচলিত সমুদায় ধর্ম্মই উপযুক্ত উপাদান সঞ্চয় করিয়া স্বীয় স্বীয় শরীরের অস্থি মজ্জার পুষ্টিসাধন করিতেছে। সরলমতি চিন্তাশীল সাহিত্যানুরাগী, ধীরমতি, বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রেই অপক্ষপাতে স্থির ভাবে ঐ সমুদায় ধর্ম্মের মূল আলোচনা করিলে এই তথ্য তাঁহাদের নিকট সুস্পষ্টরূপে প্রতীতি হইবে। এ হেন কোরান-শরীফকে আমরা কল্পতরু বলিয়াই নির্ণয় করি, কিংবা রত্নাকর নামেই অভিহিত করি, কিন্তু ইহা এক অপার্থিব অপূর্ব্ব পদার্থ! ইহার অন্তঃস্থিত তত্ত্বগুলি অনুভব করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। দুঃখের বিষয় এই যে, এখনও কতিপয় মস্তিষ্কহীন নরপিশাচ এহেন পবিত্র গ্রন্থের নিন্দাবাদ প্রচার করিয়া অভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে।

কোরান-শরীফ সম্বন্ধে খৃষ্টীয়ান লেখক মহাত্মা জন ডেভন পোর্ট বলেন,—"কোরান-শরীফের অলৌকিকত্ব এই যে, ইহার ভাষা অতি সুশ্রাব্য, মনোহর ও নির্দ্দোষ; এমন কি আরব দেশের চতুষ্পার্শ্বস্থ অধিবাসিগণ ইহার ভাষা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ ইহার প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিল। ইহার রচনা এত মধুর যে, ইহা আরবী-সাহিত্য ভাণ্ডারে

ইহার প্রথম প্রচার আরম্ভ হইতেই বহুসংখ্যক বিজ্ঞ ব্যক্তি অমানুষিক চেষ্টা করিয়াও ইহার অনুরূপ একটি পংতিও রচনা করিতে সক্ষম হয় নাই।"

মহাত্মা গিবন সাহেব বলেন, "পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর হইতে পূর্ব্বে গঙ্গানদী পর্য্যন্ত তাবৎ ভূভাগস্থ অধিবাসিগণ কোরান-শরীফকে, খোদাতালার মূল আইন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। ইহাতে দেওয়ানী, ফৌজদারী আইন এবং মানবের কার্য্য ও বিষয়াদি নিয়মিতরূপে পরিচালনা করা কেবল খোদাতালার উপর নির্ভর করায়। এক কথায় বলিতে গেলে, মহাগ্রন্থ কোরান-শরীফ, মুসলমানদিগের সাধারণ আইন। ধর্ম্ম, সমাজ, দেওয়ানী, ফৌজদারী, বাণিজ্য, যুদ্ধবিগ্রহ, বিচার প্রণালী, প্রভৃতি সমুদায় বিষয়ই ইহার মতে সম্পাদিত হয়। কোরান-শরীফ প্রত্যেক বিষয়কে নিয়মিতরূপে পরিচালন এবং দৈনিক ধর্ম্ম কার্য্য সম্পাদনে বাধ্য করায়। এতদ্ভিন্ন দৈহিক স্বাস্থ্য হইতে আত্মার মুক্তি, প্রত্যেক কার্য্য হইতে সং বাহির করা, সমাজ হইতে মনুষ্যের উপকার, পাপ হইতে ভীতি, ইহজীবনের শান্তি হইতে ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ ইত্যাদি অতি সুন্দর ও পরিষ্কাররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কেবল পবিত্র উপাসনা পদ্ধতি ও একেশ্বরবাদ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, এ কথা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিবেন।

১৩০০ সালের নবম সংখ্যা "নব্যভারত" পত্রিকায় উচ্চ হৃদয় সরলমতি মাননীয় বাবু গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় "মুসলমান-সাহিত্য" শীর্ষক প্রবন্ধে পবিত্রতম কোরান-শরীফ সম্বন্ধে স্বাধীনমতে যে গভীর গবেষণাযুক্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রিয় পাঠকপাঠিকাদিগকে উপহার না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"মুসলমানের মাতৃভাষা আরবী পাণ্ডিত্যে পরিপূর্ণ; ইহা বীরের

শিখিবার যোগ্য বটে। পরাধীন জাতির মধ্যে এরূপ ভাষার চর্চ্চা থাকিলে, স্বাধীনতার বহ্নি কিয়ৎ পরিমাণে উদ্দীপ্ত হইতে পারে, এমন ভরসা করা যায়। ফলতঃ আরব্য ভাষা দুর্ব্বল, অলস, কাপুরুষ, বিলাসী, ক্রীতদাসের ভাষা নহে,—শাণিত তরবারী বীর্য্যমান সুস্থদেহী বীরের ইহা প্রিয় ধন।

*   *   *   *   *   *

আরবী ভাষায় সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান গ্রন্থ "আল-কোরান" বা "কোরান-শরীফ"; অন্য নাম "ফোর্‌কান" বা "মাসাহেফ"। ইহা জগতের এক অমূল্য পদার্থ—এক অদ্ভুত অমূল্য গ্রন্থ। ইহা পড়িবার, পড়াইবার শিখিবার, শিখাইবার গ্রন্থ বটে। আমি নিজে হিন্দু, কিন্তু হিন্দু হইয়াও এই গ্রন্থের শতমুখে প্রশংসা করিতে পারি। এক কথায় বলিতে পারি, কোরান এক মহামূল্য রত্ন। এই রত্ন যে না দেখিয়াছে, ধর্ম্ম জগতে তাহার এখনও সম্পূর্ণ প্রবেশ হয় নাই। যাহারা কোরানকে "বদমায়েশের কল্পিত উপন্যাস" বলে, তাহারা রজক-বাহনের সহিত সখ্যতা স্থাপন করিতে পারেন; ধর্ম্মানুসন্ধিৎসু বা সাহিত্য-প্রিয় ভদ্রলোকের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ না থাকাই ভাল।

কোরানের সমগ্র কঠিন ও কঠোর আরব্য ভাষায় লিখিত। ভাবের বেশ তরঙ্গ আছে, ভাষার বেশ উচ্ছ্বাস আছে, পাণ্ডিত্যের ছটা খুব দেখা যায়; ব্যাকরণের বাঁধনী খুব মজবুত এবং শব্দবিন্যাসের চাতুর্য্য ও অলঙ্কারের সংযোজনা বড়ই সুন্দর, বড়ই কৌতূহলময়! সমুদায় সাগরে এক অপূর্ব্ব বীরত্বব্যঞ্জক তেজের লহরী ছুটিতেছে; সেই তেজে মুসলমান জাতি এখনও বাঁচিয়া আছে। অন্যদিকে ধর্ম্মের শান্তিময় ভাবও ধীরে ধীরে (অর্দ্ধ লুক্কায়িত হইয়া) দেখা দিয়াছে। এই দৃশ্য বড়ই মনোহর

কোরান ত্রিংশ অংশে বিভক্ত, এক একটি অংশের নাম "সিপারা"। এক একটি অংশ বহুধা বিভক্ত হইয়া বহুল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। এইরূপ বিচ্ছিন্নতাকে ইংরেজেরা চ্যাপটার (Chapter) বলেন, আমরা অধ্যায় বলি। কোরানে ১৪৪ অধ্যায় আছে।" *

আভাষ।

আরবী ভাষায় কার্‌নুন শব্দ হইতে কোর্‌-আন সংজ্ঞা উৎপন্ন হইয়াছে। বাঙ্গালায় কোর্‌-আন উচ্চারণ কঠিন বলিয়া সাধারণতঃ কোরান বলা হয়। এই কোরান শব্দ ব্যতীত আরও কতিপয় নাম বা সংজ্ঞা প্রকাশিত আছে। বিভাগ বা পৃথক করা শব্দবাচক "ফর্কুন" শব্দ হইতে ফুর্কান নাম হইয়াছে। কোরানের আরও একটি নাম—"মাসাহেফ", অর্থ বিরাট গ্রন্থ। অপর একটি নাম—"আল কেতাব", ইহার অর্থও বিরাট গ্রন্থ। এতদ্ব্যতীত নিম্নোল্লিখিত নামাবলীতেও অভিহিত হয়।—"কালাম শরীফ"—সম্ভ্রান্ত বাক্য। "কালা মোল্লা"—ঈশ্বর বচন। "কোরান মজিদ"—মহিয়ান্‌ কোরান, "কোরান-শরীফ"—মানাস্পদ কোরান ইত্যাদি।

কোরানের ভিন্ন ভিন্ন সুরার অন্তর্গত ৭টি স্বেজ্‌দার (প্রণিপাতের) আদেশ আছে। প্রত্যেক সুরার প্রারম্ভে "বিস্‌মিল্লাহ্‌ হির্‌ রাহ্‌মা নির্‌ রাহিম" (দাতা, দয়ালু ঈশ্বরের নামে আরম্ভ করিতেছি) লেখা আছে। কোরান পাঠারম্ভে ইহা আবৃত্তি করিতে হয়। †

* কোরান-শরীফ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ১১৪ অধ্যায়ে বিভক্ত।

† কোরান-শরীফের প্রত্যেক সুরার প্রথমে "বিস্‌মিল্লাহ্‌" লেখা আছে। পাঠ কালে প্রথমেই তাহা আবৃত্তির বিধি। কিন্তু নবম সুরায় উহা লিখিত হয় নাই। এই সুরা ভয় প্রদর্শন জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে। অতএব ইহার শিরোভাগে "বিস্‌মিল্লাহ্‌"

মহা গ্রন্থ কোরান-শরীফ কালক্রমিক ধারানুসারে অবতীর্ণ হইয়াছে। ২৩ বর্ষে প্রাদুর্ভাব কার্য্য সমাধা হইয়াছিল। প্রতি সুরায় ভিন্ন ভিন্ন সময়ের আয়াত সন্নিবেশিত হইয়াছে; সুতরাং কোরান-শরীফের প্রত্যেক অংশের অবতীর্ণ কাল ও ঐতিহাসিক ক্রমিক শৃঙ্খলা সংস্থাপন করা নিতান্ত অসাধ্য।

কোরানের শৃঙ্খলা।

এই ক্ষণস্থায়ী সংসারের যাবতীয় প্রচলিত কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা এবং ত্রিত্ববাদিত্বতার মধ্য হইতে প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনা প্রভৃতি সহজ জ্ঞানসম্ভূত সূত্রাবলম্বনে ঈশ্বর-তত্ত্ব প্রচলন জন্যই স্বর্গ-সুধা কোরান-শরীফের আবির্ভাব। বিশেষতঃ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এবং কোরান-শরীফ পৃথিবীতে প্রেরণোদ্দেশ্য ইহা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

সাধারণতঃ কোরানকে আমরা চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া নিম্ন লিখিত ভাবে বিষয় নিবার্চ্চন করিতে পারি। প্রথমতঃ মক্কাবাসীদের প্রতিমা-পূজা ও ঈহুদী সম্প্রদায়ের কুসংস্কার এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট খৃষ্টিয়ানদিগের অন্ধ বিশ্বাস আপনোদন সম্বন্ধীয় সদুপদেশ। মধ্য ভাগে বিতাড়িত ও প্রপীড়িত নব বিশ্বাসীদের হৃদয়ে সান্ত্বনা প্রদান ও ধৈর্য্যাবলম্বনীয় বাৎসল্যময় উক্তি। শেষ ভাগে জেহাদ—ধর্ম্মরক্ষার্থে প্রাণাহুতির পুরস্কার, এবং ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক বিষয়। পরিশিষ্টে সামাজিক বিধি ব্যবস্থা, ঐশ্বরিক ও নৈতিক উপদেশাবলী এবং একমাত্র পরাৎপর জগৎস্রষ্টার উপাসনা, আরাধনা, এবং তদুদ্দেশ্যে আত্মোৎসর্গ।

অসভ্য, বর্ব্বর আরবদেশের প্রচলিত কুসংস্কার পরম্পরায় অসামঞ্জস্য ও লক্ষ্যভ্রষ্টদিগকে চির একতাসূত্রে আবদ্ধ করত প্রকৃত সত্য সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব স্থাপনোদ্দেশ্যে কোরানের ও মোহাম্মদের (দঃ) সৃষ্টি, উৎপত্তি এবং আবির্ভাব। তৎকালীন বহু লোক

আদি যুগ।

সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। এই ধর্ম্মত্রয়ের যাজনকারীবর্গ প্রকৃত ঐশ্বরিক ভাববাদী নায়কাভাবে যুথভ্রষ্ট পশুতুল্য ঘোরতর কুসংস্কারাপন্ন হইয়া গভীর অজ্ঞানান্ধকারে বিচরণ করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে "একমেবা দ্বিতীয় নাস্তি"—ঈশ্বরের এই নির্ম্মল ও সরল পবিত্র মন্ত্র এবং উপাসনা পদ্ধতি স্থাপন করিতেই মহাপুরুষ ও কোরান-শরীফ প্রাদুর্ভাবের একমাত্র কারণ। হজরত তাহাদিগকে কোরানোক্ত আদেশ ও উপদেশ প্রদানে ইহ জীবনে এবং পরকালের পুরস্কার ও দণ্ডভোগের উপদেশামৃতে তাহাদের বিশুষ্ক জীবনে সঞ্জীবনী সঞ্চারে তাড়িতপ্রায় চৈতন্যোদয় করেন। বিশেষতঃ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্থির ও প্রচার করাই কোরানের ভিত্তি-মূল। এই মহাগ্রন্থই ইস্‌লামের কেন্দ্রস্বরূপ।

কোরান পাঠের নিয়ম।

কোরান-শরীফ অধ্যয়নকালে বিশেষ আয়াতে মস্তক অবনত করিয়া কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিতে হয়। এই সকল কার্য্যকে 'রুকু' বলে। কোরান পাঠের বা নামাজের ব্যবচ্ছেদরূপে রুকু ব্যবহৃত হয়। সুরা সমূহের প্রারম্ভে প্রত্যেক সুরার রুকুর সমষ্টি আছে।

পবিত্র কোরান-শরীফ ২৩ বর্ষে সম্পূর্ণ আবির্ভূত হয়। ৯৬ অধ্যায়ের প্রথম পাঁচ আয়াত প্রথম বারে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। যখন কোন নূতন আয়াত অবতীর্ণ হইত, হজরতের মুখ-সুধা হইতে তাহা প্রকাশ মাত্র অনুচর ও সহচরগণ লিখিয়া লইতেন। উহা তাঁহারা পরস্পর নকল করিয়া লইয়া আপনাদিগের মধ্যে সযত্নে রাখিতেন। কিন্তু অধিকাংশ লোক কণ্ঠস্থ করিয়াই রাখিতেন। *

বিভাগ।

আরব্য ভাষায় এই বিভাগকে একবচনে সুরা বলে। কোরান প্রসঙ্গ ভিন্ন অন্য কোনও স্থানে সুরা ব্যবহৃত হয় না। বাঙ্গালায় ইহাকে শ্রেণী বলে। প্রত্যেক সুরা ছোট বড় অনেকগুলি পদে বিভক্ত। আরবীতে এই সকল পদকে আয়াত বলা হয়।

কোরান-শরীফ ৩০ ভাগে বিভক্ত। উক্ত বিভাগকে একবচনে জুজ্, বহু বচনে আজুজ্ বলে। জুজ্ পারস্য শব্দ। উর্দ্দু ভাষায় এ বিভাগ সিপারা নামে অভিহিত হয়। প্রত্যেক সিপারা চারি ভাগে বিভক্ত; প্রথমাংশ, অর্দ্ধাংশ, তৃতীয়াংশ, চতুর্থাংশ (আর্‌বা, নেস্‌ফ, সালাসা, রোবা)। নরপতি হাজ্জাজের রাজত্বকালে তদীয় আদেশে কোরান-শরীফের এইরূপ বিভাগ হয়।

তৎপর পুনঃ ১৮ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ইহাকে মেন্‌কা বলা হয়। পাঠ ও কণ্ঠস্থ করিবার সুবিধার্থে এই সকল বিভাগ করা হইয়াছে। হজরত উস্‌মান গণী শুক্রবার রাত্রিতে পাঠারম্ভ করিয়া বৃহস্পতিবার সমাপ্ত করিতেন। তদনুসারে কোরান সপ্ত ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এই বিভাগের নাম মঞ্জেল। কেহ কেহ বলেন,পবিত্র রমজান মাসের ৩০ দিবসে সমগ্র কোরান পাঠ সমাপ্ত হওয়াতে ৩০ সিপারায় বিভক্ত হইয়াছে। এই সিপারা, মেন্‌কা, মঞ্জেল অনুপাতে কোরান ১১৪ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

কোরান ঈশ্বর বচন।

হজরত মোহাম্মদ (দঃ) অনক্ষর মহাপুরুষ ছিলেন। কোরান-শরীফ ঈশ্বর প্রদত্ত স্বর্গীয় মহাগ্রন্থ। জেব্‌রীল নামধেয় স্বর্গীয় দূত কর্তৃক উহা ক্রমশঃ হজরতের নিকট অবতীর্ণ হয়। সমগ্র কোরান এক সময় আবির্ভূত হয় নাই। এক একটি বচন (আয়াত) ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন সময় প্রয়োজন মত প্রেরিত হইত। এইরূপে ২৩ বর্ষে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন স্থানে কোরান অবতীর্ণ হইয়াছে। সুতরাং কোরান-শরীফে বিশেষ শৃঙ্খলা বিধান পরিলক্ষিত হয় না, বরং জটিলতা প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

কোরানের কোন কোন অংশের নিগূঢ়-তত্ত্ব ঈশ্বর এবং হজরত

ও অতি দুরধিগম্য। অতএব যাবতীয় শাস্ত্র-বিশারদ বিজ্ঞ-চূড়ামণিগণ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও উহার স্নিগ্ধ ভাব-সলিলে অবগাহন করিতে সক্ষম হন না। যথা, সুরে বাকরের প্রথম—আলেফ—লাম—মিম। কেহ এই অক্ষরের ভাবার্থ, আলেফে আল্লা, লামে লাতিফ, মিমে মজিদ বলেন। বাঙ্গালার্থ, সদয় ও গৌরবাস্পদ ঈশ্বর; কেহ বলেন—ইহার সঙ্কেত, আল্লা, লতিফ, মাজিজ; অর্থাৎ ঈশ্বর দয়ালু ও মহিমান্বিত। কোন তত্ত্বজ্ঞ বলেন, আল্লা, জেব্‌রীল, মোহাম্মদ। অর্থাৎ ঈশ্বর কোরানের স্রষ্টা, জেব্‌রীল কোরান অবতারক এবং হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কোরান প্রচারক। এইরূপ অনেকে অনেক ব্যাখ্যা করেন।

পবিত্র কোরান-শরীফ ঈশ্বর বচন ও ঈশ্বর প্রেরিত। উহা, অনাদি ও সৃষ্টির পূর্ব্বাবধি ঈশ্বরের সমীপে ছিল। সেই বিশ্বপিতার সিংহাসনে (লৌহ্ মাহ্‌ফুজে) এক অসীম বৃহৎ রক্ষিত ফলকে উহার অনুলিপি বিলিখিত ও সংরক্ষিত ছিল। তদনন্তর ঐ ফলক দৃষ্টে অপর একটি অনুলিপি প্রস্তুত হইয়া রমজান মাসের এক পবিত্র রজনীতে (শব কদরে) জেব্‌রীল কর্ত্তৃক নিম্নস্তর স্বর্গে আনীত হয়। তথা হইতে প্রয়োজন মত হজরতের সমীপে প্রাদুর্ভূত হয়। জেব্‌রীল উহার এক এক বচন লইয়া মক্কা ও মদিনা-নগরীতে ক্রমাগত ২৩ বর্ষ ব্যাপিয়া বিভিন্ন সময়ে হজরতের নিকট অবতীর্ণ হয়েন। হজরতকে জেব্‌রীল সমগ্র কোরান বৎসরে একবার প্রদর্শন করাইতেন। তিনি জীবনের শেষ বর্ষে সমগ্র গ্রন্থখানি দুইবার দেখিতে পাইয়াছিলেন। উহা স্বর্গীয় অমূল্য সুবর্ণ মণি-মুক্তা-খচিত অলঙ্কারে বিভূষিত ছিল।

হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কোরান বিবৃত করিলে, সর্ব্ব প্রথম তাহা গ্রন্থাকারে আবদ্ধ বা কোনও রূপ একত্রিভূত করা হয় নাই। মহাপুরুষের

আবুবাকর ও হজরত উমর (রাঃ) সমুদায় বচন (আয়াত) একত্র করিতে যত্নবান হন। কেন না, তখন কোরান-শরীফ অনেকেরই কণ্ঠস্থ ছিল, কিন্তু এই সময় গ্রন্থাবদ্ধ না করিলে, তাহাদের তিরোধানের সহিত এই অমূল্য অপার্থিব সম্পত্তি বিলোপ প্রাপ্ত হইবে। বিশেষতঃ যুদ্ধ বিগ্রহে তাঁহারা যেরূপ আনন্দের সহিত প্রাণাহুতি করিতেছেন, ইহাতে হজরতের সমকালীন শ্রোতৃবর্গের সংখ্যা শীঘ্রই লয় প্রাপ্ত হইতে পারে। অতএবই পরম ধর্ম্মপরায়ণ সচ্চরিত্র নিষ্ঠাবান মহাত্মা জায়েদ উৎসাহের সহিত এই সংগ্রহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, বহু পরিশ্রমে নানা স্থান হইতে খর্জ্জুর-পত্র লিখিত ও প্রস্তর খোদিত এবং মনুষ্যের হৃদয় পটে চিত্রিত বচন সমূহ সংগ্রহ করেন। *

কোরান-শরীফের ঐতিহাসিক তত্ত্ব।

এই সংগৃহীত-রত্ন দশবৎসর হজরত আবুবাকরের নিকট সযত্নে রক্ষিত ছিল। তৎপর তদীয় অন্তর্ধানে হাফ্সা নাম্নী হজরতের সহধর্ম্মিণীর নিকট গচ্ছিত ছিল। হজরত উমরের স্বর্গারোহণের পর হজরত উস্মানের সময় নানা স্থানে উহার প্রতিলিপি বিস্তৃত হয়, কিন্তু সে সমুদায় পরস্পর এত বিভিন্নরূপে লিখিত হইয়াছিল যে, তজ্জন্য জনমণ্ডলীর মধ্যে বিষম বিবাদ বিসম্বাদ আরম্ভ হইয়া উঠে। অতএব হজরত উস্মান গণী পুনশ্চ সেই মহানুভব জায়েদ কর্ত্তৃক কোরান সংগ্রহ করত বাদ বিসম্বাদ মিটাইয়া দেন। এই নূতন সংগৃহীত কোরান-শরীফের বহু খণ্ড প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়া সমুদায় প্রধান প্রধান নগরে প্রেরণ করা হয়।

---

* ধর্ম্মাত্মা জায়েদ মদিনাবাসী। তিনি প্রথম হজরতের ক্রীতদাস ছিলেন, এবং খোদেজা দেবীর পরই হজরত আলী, তৎপর তিনি ইস্লাম গ্রহণ করেন। তদীয় প্রগাঢ় ধর্ম্মানুরাগ দর্শনে হজরত তাঁহার দাসত্ব মোচন করিয়া দেন। এহেন পুণ্যাত্মা পুরুষ যে মহাগ্রন্থ কোরান সংগ্রহ করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

মহানুভব জায়েদ এই সংগ্রহ কালে গ্রন্থ মধ্যে কোনও রূপ আপনার পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেন নাই। তিনি যেখানে যেমন পাইয়াছেন, তেমনই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তজ্জন্যই ইহার অধ্যায় সমূহ পর পর না হইয়া বিশৃঙ্খল ভাবে সন্নিবেশিত দেখা যায়। এমন কি, সুরা সকলের মধ্যে আয়াতেরও এমন গোলযোগ যে, তাহাতে অনেক স্থলে অসংলগ্ন বোধ হইয়া থাকে।

কোরান-শরীফ কোরাইশীয় জাতির কথিত আরব্য ভাষায় বিরচিত। ইহার পদবিন্যাস ও রচনা কৌশল এত চমৎকার যে, একজন বর্ণ-জ্ঞান-হীন ব্যক্তির মুখ হইতে তাহা অনর্গল নির্গত হওয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অলৌকিক ব্যাপার, সন্দেহ নাই। এই জন্য অনেক আয়াতে দর্পের সহিত উল্লিখিত দেখা যায়—"পৃথিবীতে এমন কোন্ ব্যক্তি আছে যে, ইহার ন্যায় একটি আয়াত রচনা করিতে পারে?" বাস্তবিক, তৎকালে আরব দেশে পণ্ডিত, রচয়িতা, কবি ও সুবক্তার অভাব ছিল না; এই শ্রেণীর অসংখ্য লোক হজরতের চারিদিক পরিবেষ্টন করিয়া কোরান শ্রবণ করত বলিয়া যাইত, "এব্যক্তি নিশ্চয় কোন ভূতের সাহায্যে এরূপ অলৌকিক বাক্য প্রকাশ করিতেছে।" তাৎকালিক প্রধান কবি লবিদ পৌত্তলিক ছিলেন। এক দিন তিনি হঠাৎ একটি বচন শ্রবণ মাত্র বলিলেন—"এ প্রকার ভাষা প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত কেহ বলিতে পারে না।" তিনি এই বিশ্বাসে ইস্লাম গ্রহণ করেন এবং যে সমুদায় অবিশ্বাসী সনাতন ইস্লামকে নিন্দাবাদ করিয়া রহস্য বিদ্রূপজনক কাব্য ও কবিতা সমূহ রচনা করিয়া প্রচার করিত, তিনি সেই সমস্তের প্রত্যুত্তর প্রদানে চিরজীবন ধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া ভব-লীলা সাঙ্গ করিয়া গিয়াছেন।

উত্থান-গীতি।

(১)

কোথারে বসন্ত সখা! পঞ্চমে তুলিয়া
গাও একবার শুনি' জুড়াই শ্রবণ।
নাচরে বিহঙ্গ-কুল গরবে ভরিয়া,
নাচাও উৎসাহে আজি সবাকার মন।

(২)

গরজ অশনি ভীম কাঁপাইয়া ধরা,
চির স্থির মেঘ কোলে খেল সৌদামিনী—
হউক মোস্লেম প্রাণ তাহে মাতোয়ারা,
খেলুক বিদ্যুৎ বেগে তাদের ধমনী।

(৩)

মোস্লেম! আকাশ পানে তাকাও বারেক,—
ফুটেছে কেমন আজ নক্ষত্রের দল;
কারোনা হৃদয়ে হয় সুখের উদ্রেক,
কে না হয় হেরে উহা আনন্দে বিহ্বল?

(৪)

কতকাল আর ওহে ভ্রাতৃগণ?
এরূপে কাটাবে অমূল্য জীবন?
উন্নতির পথে হবেনা গমন?
করিবেনা কিহে উন্নতি কামনা?

কতকাল আর আলস্যে সেবিয়া,
জাগ্রতে ঘুমাবে নয়ন মেলিয়া ?
হেন ভাবে বসি ক্ষীণাশা ধরিয়া,
রবে আজনম হয়ে হীন মনা ?

(৫)

কর্ম্ম ক্ষেত্র পানে দেখহে চাহিয়া,
শ্রম যত্নে সবে দেহ ঘামাইয়া,
লভিছে সুযশঃ দেখনা ভাবিয়া
তারাও ত বটে মানব জাতি !
তবে হে তোমরা কিসের কারণ,
নিবু নিবু আশা করিয়া ধারণ,
পেতেছ যাতনা —মরম পীড়ন—
পোহাও কেবলি আঁধার রাতি !

(৬)

যাওহে সকলে মিলিয়া মিশিয়া,
কর্ম্ম ভূমি মাঝে আলস্য ত্যজিয়া,
করহে সাধনা আনন্দে মাতিয়া,
সিদ্ধি একদিন হবেই হবে।
হেরিবে তখন শান্তি-সুখ-রবি,
পাইবে ফিরিয়া অতীতের ছবি,
লভিবে আবার বিগত পদবী,

(৭)

অতীত গৌরব করিয়ে স্মরণ,
বর্ত্তমান দশা কর বিলোকন,
কি ছিলে তোমরা কি হচ্ছ এখন,
কি দশা অহো! দেখ দেখি চেয়ে!

তোমরা—

ছিলে একদিন রাজ-রাজেশ্বর,
রাজ দণ্ড করে, মস্তক উপর
ছিল শোভমান রত্নের টোপর,
স্মৃতি আজি তার রয়েছে পড়িয়ে।

(৮)

গিয়াছে সে সব—পথের কাঙ্গাল,
নাহি এবে আর কড়ার সম্বল
নাহি আজি কারো হৃদয়েতে বল,
মোহের ঘোরেতে রয়েছ পড়ে।
তোমাদেরই পিতা, পিতামহগণ,
জ্ঞানের বিমল জ্যোতিঃ প্রদর্শন,
করেছিলা হায়! সমগ্র ভুবন,
সনাতন ধর্ম্ম হৃদয়ে ধরে।

(৯)

সততা, নম্রতা, সম্ভ্রম, সম্মান,
দরিদ্রকে দান, পতিত কল্যাণ,
কে শিখাইল ভবে এ নীতি মহান,
দেখহ বারেক স্মরণ করি।

সাম্য মৈত্র ভাব তারাই শিখাল,
ন্যায় স্বার্থ ত্যাগ তারাই দেখাল,
একেশ্বরবাদ তারাই আনিল,
পবিত্র কোরান শিরসে ধরি।

(১০)

মূর্ত্তি পূজা আর ঘৃণ্য সুরা পান,
অক্ষ ক্রীড়া আরো কুসিদ গ্রহণ,
মহা পাপী হয় করয় যে জন,
তারাই শিখাল জগত জনে।
তোমরা কি হায়! তাদের সন্তান,
ছাড়ি ধর্ম্ম কর্ম্ম সত্য সনাতন,
কু-পথে কু-মতে কর বিচরণ,
লক্ষ্য ভ্রষ্ট আজি প্রতি জনে জনে?

(১১)

হায়!—
তোমরাই অহো ছাড়িয়া সকল,
ইন্দ্রিয় থাকিতে হয়েছ বিকল,
হয়েছ এবে রে হত হীন বল,
সকলি আপন করম-দোষে।
আবার আবার সকলে মিলিয়া,
লওনা সে ধনে যতনে কুড়া'য়া,
হারাধন পুনঃ লওহে তুলিয়া,
পড়িয়াছে যাহা বুদ্ধি দোষে খ'সে।

(১২)

পূর্ব্ব পুরুষের কীরতি বিভব,
ভেবে একবার দেখ দেখি সব,
ছিল কি মহিমা, জ্ঞানের অর্ণব,
অক্ষয় ভাণ্ডার, অপার যশঃ।
তোদেরি ছিলরে দিল্লী-সিংহাসন,
তোদেরি ছিলরে অৰ্দ্ধ ধরাসন,
তোদেরি ছিলরে কোহিনূর ধন,
এখন ভিখারী কড়ার বশ!

(১৩)

তোদেরি ছিল সে শাহ আকবর,
তোদেরি ছিলরে সুমতি বাথর,
তোদেরি ছিলরে বীর সেকান্দর,
যাঁহার দ্বিতীয় হবে না আর।
তোমরাই বঙ্গে করিতে বিরাজ,
তোদেরই ছিল নওয়াব সিরাজ,
কে বলেরে তাঁরে পাপী দুষ্টরাজ,
যে বলে সে পাপী অতি দুরাচার।

(১৪)

তোমরাই কর শিল্প অনুষ্ঠান,
তোমরাই কর দর্শন বিজ্ঞান,
তোমরাই কর আইন বিধান,
তবে তো পেয়েছে অপর নরে।

তোমাদেরি তাজ, মতি মনোহর,
তোমাদেরি তক্ত তাউস সুন্দর,
মস্‌জেদ, মিনারা, হেন কত আর,
এখনও বিরাজে ধরার'পরে।

(১৫)

"নাই আলমগীর ধার্ম্মিক ধীমান,
নাই আকবর সম্রাট্ প্রধান,
নাই জাহাঁগীর, নাই শাজাহান,
ডুবিয়া গিয়াছে কালের জলে।
নাই সে নজীব, নাই আলীবর্দ্দী,
নাই সে ফিরোজ, নাই সে উবেদী,
নাই সুজা, গাজী, ইব্‌রাহীম লোদী,
আজি যে তাঁহারা সমাধি তলে।

(১৬)

"নাই সফদর, মহবত বীর,
আবুল ফজল, ফয়জী গম্ভীর,
নাই আহ্‌মদ পণ্ডিত সুধীর,
গিয়েছে তাঁহারা অনেক দিন।
ভারত দুঃখিনী চির বিষাদিনী,
স্মরি সেই সব পুত্রের কাহিনী,
আজি মর্ম্ম দুঃখে ঘোর বিষাদিনী,
দাঁড়াইয়া অই বদন মলিন।

(১৭)

"আজিরে মোস্লেম ধূলায় লুণ্ঠিত,
শত ছিন্ন বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত,
নয়নের জলে বদন প্লাবিত,
মূর্ত্তিমতী যেন বিষাদ-রাশি।
বদনে কালিমা নয়নে নীলিমা,
সৌন্দর্য্যের আর নাই সে মহিমা,
বীরত্বের আর নাই সে গরিমা,
সকলি গিয়াছে সাগরে ভাসি!

(১৮)

"অই দেখ যত বিপক্ষ সকল,
করতালি দিয়া হাসে খল খল,
ছিছি—ছিছি—বলে ভিন্ন জাতি' দল,
বারেক কি তাহা দেখনা চেয়ে?
ধিক্ তোমাদের বিরাট সভারে,
ধিক্ তোমাদের গভীর চিৎকারে,
ধিক্ তোমাদের আত্ম অহঙ্কারে,
—আজিও রয়েছ উদাস হয়ে?

(১৯)

"লজ্জায় এখন শির কার নত,
করহ যতন হইতে উন্নত,
কর'না গরব পাগলের মত
মেল গলে গলে কলহ ছাড়ি।

নতুবা কলসী রসি বাঁধি গলে,
মরহ ডুবিয়া জলধির জলে,
তা'হলে হইবে শান্তি ধরাতলে,
হবেনা কলঙ্ক জগৎ ভরি।

(২০)

"আরবের ভীম মরুর মাঝার,
নাশি অজ্ঞানতা ঘোর অন্ধকার,
নবীন বিভায় বিকাশিয়া কর,
ইস্লাম-তপন উদিল যবে,—
একতা শৃঙ্খলে বাঁধা পরস্পরে,
'দিন' 'দিন' রবে প্রমত্ত অন্তরে,
দেখাল মহিমা ধরণী উপরে
পুনঃ কি আবার সেদিন হবে?

(২১)

নাহি এবে আর সেই সুখ-স্থান,
নাহি এবে আর সেই ধন মান,
নাহি রাজ্য পদ সর্ব্ববিধ জ্ঞান,
হারায়ে হ'য়েছ উদাস পারা!
ভেবে এবে তাহা কিছু হবে নাই,
এসহে আবার নৈপুণ্য দেখাই,
মানব অসাধ্য কিছুমাত্র নাই,
হৃদয়ে ধরহে সবে এ ধারা।

(২২)

এখনও কি হায়! বসিয়া থাকিতে,
রুচি হয় মূর্খ! দেখনা অতীতে,
কিবা ছিলে কিবা সাজিয়াছ তাতে,
এসব স্মরণে হয়নারে লাজ?
শুধু রাজ-ভাষা অবহেলা করি,
অবনতি কূপে পড়িয়াছ ঘুরি',
ভিন্ন জাতি কত মারে লাথি ছুড়ি',
এখনো অধম! সয় কিরে ব্যাজ?

(২৩)

ভক্তি সহ পালি' ধর্ম্ম সনাতন,
সবে মিলি' কর উন্নতি সাধন,
সবে মিলি' কর বিদ্যা অধ্যয়ন,
বাণিজ্য শিলপে লাগাও মন!
"উদ্দেশ্য সাধিতে ছার এই দেহ,
নাশিতে বিমুখ না হইব কেহ"
দৃঢ়তার সহ না করি সন্দেহ,
সকলে মিলিয়া কর এ পণ!!

(২৪)

নব পত্র-পুষ্প লইয়া আবার,
এসেছে বসন্ত অবনী মাঝার,
তরুরাজি আজি প্রফুল্ল অন্তর,
নাচিছে সবি ঈশ-ভক্তি-ভরে।

হর্ষে মাতোয়ারা যত জীবগণ,
আনন্দ উচ্ছ্বাসে মাতায়ে ভুবন
ভক্তিপ্লুত হৃদে মহিমা কীর্ত্তন,
করিছে ঈশের বিবিধ স্বরে।

(২৫)

হেন শুভযোগে এস ভ্রাতৃগণ,
ইস্লাম-কলঙ্ক করিতে মোচন,
এক মন্ত্রে দীক্ষা লও সর্ব্বজন,
শিক্ষা-কল্প-তরু কেতন মূলে।
ধনী ও দরিদ্র আছ যে যেথানে
আলস্য ত্যজিয়া সবে এক প্রাণে,
ছুট সবে ঐ কর্ম্ম-ভূমি-পানে,
দ্বেষ ও হিংসা ভুলিয়ে সকলে।

(২৬)

পুনঃ বলি—
ভক্তি সহ পালি' ধর্ম্ম সনাতন,
সবে মিলি' কর উন্নতি সাধন,
সবে মিলি' কর বিদ্যা অধ্যয়ন,
বাণিজ্য শিলপে লাগাও মন!
"উদ্দেশ্য সাধিতে ছার এই দেহ,
নাশিতে বিমুখ না হইব কেহ"
দৃঢ়তার সহ না করি সন্দেহ,
সকলে মিলিয়া কর রে পণ!!

সমাজ-চিত্র।

আবেগ।

এই বিশাল বিশ্বসংসারে আমাদের স্থান নাই—এই অনর্গল অবনী-মণ্ডলে আমাদের প্রবেশ-পথ নাই। আমরা যে দিকে যাই, সেই দিকই রুদ্ধ;—যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, সেই দিকেই দেখিতে পাই, বিকট-বদনা, ভ ষণ-দশনা নিরাশা-রাক্ষসী করাল কবল ব্যাদন করিয়া দণ্ডায়মানা!

আমাদের মনপ্রাণ শূন্য—হৃদয় অপূর্ণ। কিন্তু, হায়! দয়াময়ের সাধের সংসারে কি আমাদের স্থান সংকুলান হইবে না? শান্তিহীন জীবন লইয়াই কি আমরা জগতীতলে অহর্নিশি বিচরণ করিব?—হে শান্তিময় দীন-বন্ধো! বলিয়া দাও, কতদিন আর এরূপ লক্ষ্যভ্রষ্ট দিশাহারা উল্কার ন্যায় পরিভ্রমণ করিব? কত দিনে আমাদের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হৃদয়ের আশাবীজ অঙ্কুরিত হইবে? আর কত দিনে আমাদের সঙ্কীর্ণাদপি সঙ্কীর্ণ হৃদয় অনন্ত প্রেমের—অসীম সৌন্দর্য্যের বিমল আভায় বিভাসিত হইবে? অজ্ঞানন্ধকার-সমাচ্ছন্ন—শোক তাপ, নিরাশ মনস্তাপ, মর্ম্ম-বেদনা সমাকুলিত চির আবেগ অপনোদিত হইবার আর কত দিবস বাকী? সংসারে আসিয়া কি আমরা প্রতিনিয়তই নিরাশার সূচীভেদ্য অন্ধকারে ভ্রমণ করিব? উঃ! আমাদের ন্যায় কীটাণুকীটের আশা অপূর্ণ থাকিবে না ত থাকিবে কার? নগণ্যদের মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ হইলে, জগতে অপূর্ণ থাকিবে কি?

নিখিল ভূমণ্ডলের অগণ্যের তুলনায় আমরা অতি নগণ্য মানব মাত্র; অনন্ত-বিশ্ব-সংসার-সমুদ্রে অতি ক্ষুদ্র জলবুদ্বুদ সদৃশ ভাসিতেছি।

অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তন স্রোত-বেগে দিক নির্ণয় করিতে না পারিয়া, হতাশ হৃদয়ে শূন্য মনে ভাগ্য-গগনের দিকে চাহিয়া কত কি ভাবিতেছি। ভাবিতেছি—আমরা যে জগতের জীব হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, আমাদেরই ভাগ্য-দোষে গ্রহ বিপর্য্যয়ে সেই সুখ-সম্পদ-সমন্বিত জগত কি অন্তর্হিত হইল? সেই চন্দ্র, সেই নক্ষত্ররাজি বিভূষিত অনন্ত নীলাকাশ মস্তকোপরি বিরাজিত, তবে সুখ পাইনা কেন? বসন্ত-সখার ললিত-সঙ্গীতালাপে চারিদিক মুখরিত, কিন্তু আমাদের হৃদয়-কাননে শান্তি-পীযূষ বর্ষণ করে না কেন? নীল নৈশাকাশে প্রস্ফুটিত তারকামালার ন্যায় আমাদের হৃদয়োদ্যানে সু-প্রসূন ফুটেনা কেন? হায় রে! আমাদের আশা-কানন কি চিরতরে বিশুষ্ক হইল?

আমরা যে আশা-লতাকে সুযতনে হৃদয়-কাননে রোপণ করিয়াছিলাম, কে তাহা ছিন্ন করিল? যদি ছিন্ন করিল, তবে স্বমূলে উৎপাটিত করিলনা কেন? সেই মূল যে এখন কুলীশ কঠোর শূলে পরিণত হইয়া হৃদয়ের স্তরে স্তরে বিদ্ধ করিতেছে! এ শূল-মূল কি নির্ম্মূল হইবার নয়? এ মূলের কি ধ্বংস নাই? বিনাশ নাই?—

হে পতিত পাবন জগত পিতঃ! কত দিনে আমাদের এই শোক দুঃখ, তাপদগ্ধ হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইবে? কত দিন এই অন্তঃসার শূন্য হৃদয় লইয়া জগতীতলে বিচরণ করিব? কত দিন এই অপূর্ণ হৃদয়ের অপূর্ণ ভাব আমরা অপূর্ণ ভাষায় ব্যক্ত করিব?

যে শূন্য হৃদয় লইয়া—যে তাপিত প্রাণ লইয়া আমরা মাঠে মাঠে ঘুরিতেছি, বোধ হয়, তাহা আর জীবনে পূর্ণ হইবার নয়! তাই আজ প্রাণের আবেগে কাতর কণ্ঠে বলি, হে পতিত পাবন দীননাথ! হে দুঃখীতের আশা পূর্ণকারী দীন-বন্ধো! আর কত দিন আমরা নৈরাশ্যের মরীচিকা ভ্রমে পরিভ্রমণ করিব!

আধুনিক সমাজ।

প্রথম প্রস্তাব।

কতকগুলি বিষয় আছে, যাহা ব্যক্তি বিশেষের মুখেই ভাল শোভা পায়, এবং তাহাদের ভিন্ন অপরের যেন সে সমস্ত বিষয়ে কথা বলিবারই অধিকার নাই। অথবা বলিলেও যেন তাহা শ্রবণোপযুক্ত, ভ্রম শূন্য বা দোষ শূন্য হওয়া সম্ভবপর নয়। (তাহাদের নিকট ন্যায় শাস্ত্র চলে না বলিলেই হয়।) যদ্যপি অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স্ক কোন ব্যক্তি তাহাদের সহিত কোনও বিষয় বিচারে প্রবৃত্ত হন, তবে তাহারা স্বীয় বয়সোচিত সমবন্ধৃচিত ভর্ৎসনাতেই উহার উত্তর সারিয়া লন। আমাদের সামাজিক বিষয়গুলিও এই শ্রেণীর। উক্ত বিষয়ের আলোচনা যেন লাটপূজক বিশিষ্ট হুকাধারীদের নিজস্ব সামগ্রী; ইহাতে যেন অপরের কথা বলিবার বা দোষ গুণ আলোচনা করিবার অধিকারই নাই। দুর্ভাগ্য বশতঃ এই সামান্য প্রবন্ধের হীনতম লেখক উপরোক্ত কোনও দলেরই অন্তর্ভুক্ত নয়, অতএব বোধ হয় তাহার পক্ষে সামাজিক বিষয় আলোচনা করা বিড়ম্বনা মাত্র। এজন্য প্রথমেই নিবেদন করিয়া রাখি, পাঠক! আমার অনধিকার চর্চ্চা ক্ষমা করিবেন।

আমাদের বর্ত্তমান সমাজটি অনেক স্থলে হাতী উৎসর্গ ব্যাপারের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যখন সেই হাতী বয়ঃবৃদ্ধির সহিত বিক্রম প্রকাশ করিতে থাকে, তখন মাহুতের পক্ষে উহা বড়ই বিপদ জনক হইয়া উঠে। তাহারা তখন নিতান্ত সঙ্কটে পতিত হয়। দারুণ দৌরাত্ম্যের ভয়ে হস্তীকে অতি মোটা রজ্জু দ্বারাও আবদ্ধ রাখা সুকঠিন, আবার বন্ধন মুক্ত করিয়া

ছাড়িয়া দিতেও পারা যায় না। কারণ,—জনসাধারণের কোনও অনিষ্ট করে বা তৎকর্ত্তৃক কেহ আহত হয়! বর্ত্তমান কালে আমাদের সমাজটিও ঠিক সেইরূপ নয় কি? ইহাও বিক্রমে হস্তীর ন্যায় দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিতেছেনা কি? হাতীকে আবদ্ধ রাখার ন্যায় আমাদের বর্ত্তমান সময়ে সমাজ-গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকা কঠিন নয় কি? আর যদ্যপি সমাজ ত্যাগ করি, তাহা হইলে অধিক ক্ষতি;—জাতীয় উন্নতির একটি প্রশস্ত সুন্দর পথ একবারে অবরুদ্ধ হইয়া পড়ে।

হস্তী যখন প্রথম প্রথম দুর্দ্ধর্ষ হইয়া সর্ব্বদাই বন্ধন ছিন্ন করত পলাইতে চেষ্টা করে এবং তাহার তাড়নায় যখন অস্থির হইতে হয়, তখন রক্ষকগণ লৌহ-শৃঙ্খল দ্বারা সংবদ্ধ করিয়া ও নানা কৌশলে বাঁধিয়া রাখিতে চেষ্টিত হয়। পরে যখন সাধ্যমত চেষ্টা যত্নেও বশীভূত রাখিতে পারা যায় না, তখন অগত্যা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। সেই প্রকার আমরাও যখন সমাজের কঠিন স্থানে আবদ্ধ থাকিতে বিশেষ কষ্ট বোধ করি,—যখন তাহার শাসনে পীড়িত হই, তখন আমরাও মুক্তির আশায় সমাজকে পরিত্যাগ করি। কিন্তু, ইহার পরিণাম ফল অতি ভয়াবহ! তখন সেই গজধর তুল্য সমাজ আমাদিগকে বিবিধ যন্ত্রণা দিতে উদ্যত হয়। আমাদের উন্নতির মূলে তীব্র হলাহল ঢালিয়া দেয়।

জাতীয় গৌরব, জাতীয় উন্নতি এবং জাতীয় জীবনগঠন করিবার একটি প্রধান উপাদান একতা। কিন্তু, উহা সমাজের সহিত দৃঢ়রূপে সংলিপ্ত; অতএব সমাজ ত্যাগ করিলে জাতীয় উন্নতির আশা সুদূর পরাহত।

বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ সমাজের অবস্থাই শোচনীয়—স্বেচ্ছা গঠিত। আজকাল ব্যক্তিগণ সমাজের অধীন নয়, সমাজই তাহাদের অধীন। অবশ্য সমাজ চিরদিনই ব্যক্তিসমূহ কর্ত্তৃক গঠিত; কিন্তু, বিচারপতি প্রজাগণের নিমিত্ত যেরূপ আইন অনুষ্ঠান করেন অথচ তিনি নিজেও

কোন অপরাধ করিলে সেই আইনের অধীন হন, তদ্রূপ সমাজের নিয়ম— ছোট বড়, রাজা প্রজা সকলেই তাহার সমান অধীন।

এক্ষণে অধিকাংশ সমাজের কেহ একজন নির্দ্দিষ্ট নেতা নাই। পূর্ব্বে, প্রত্যেক পৃথক পৃথক সমাজে উপযুক্ত কোন সদ্বংশজাত শিক্ষিত সাম্যবাদী বিচক্ষণ ব্যক্তিকে সমাজপতি নির্ব্বাচিত করা হইত। তিনি যেরূপ অবস্থারই হইতেন, তাঁহাকে সকলেই যথোচিত সম্মান করিতেন। সমাজপতি যগুপি কোন অপরাধের জন্য কাহাকেও দণ্ডবিধান করিতেন, তাহা সসম্মানে প্রতিপালিত হইত। আধুনিক সময় তাঁহাদের আসনে কেহ উপবিষ্ট নাই। যদিও কেহ সেই বিশ্বস্মরণীয় আসন অধিকার করেন, তবে তিনি কোনও অপরিণামদর্শী, নব্যতন্ত্রের নব্য যুবক বা ধনী সন্তান কিংবা ঘোর স্বার্থপর ব্যক্তি। বংশ মর্য্যাদা, বা বিদ্যা বুদ্ধি, সামাজিকতা, দেশের দশজনের স্বত্ব এবং স্বার্থ সংরক্ষণ প্রভৃতি গুণপনার সহিত সংশ্রব পরিশূন্য। তাহাদের কার্য্য কেবল পিতা—পিতামহের সঞ্চিত ধনরাশি বিলাসি দ্বারা বিনষ্ট করা এবং লম্বা লম্বা উপাধি লাভ করা। এরূপবস্থার লোক সমাজের উপকার উন্নতি করিবে কি, দিবানিশি স্বীয় স্বার্থ লইয়াই মহা ব্যতিব্যস্ত থাকেন, পরন্তু একজন অবস্থাহীন স্বজাতির সঙ্গে কথা বলিতেও লজ্জা, অপমান এবং ঘৃণা বিবেচনা করেন। কিন্তু তাহারা সমাজের কিছু পরিবর্ত্তন করিতে পারিলেই যেন মনে করেন যে, তাহাদের সকল কাজ করা হইল। পূর্ব্ব প্রচলিত প্রথা সমুদায় একবারে দোষ ও ভ্রমে পরিপূর্ণ। ইহা যেন তাহাদের পরীক্ষিত সত্য। অথচ সেই কারণেই অনেক সময় তাহাদের নিজকৃত দোষকেও "দোষ" মনে করেন না—যদি দোষ হয় তবে তাহা সমাজের। তাহাদের ধারণা, তাহাদের বিবেচনায় কোনও দোষ বা ভ্রম হইতে পারে না। আবার, কেহ তাহাদের কার্য্যাবলী সমালোচনা, আলোচনা করিলে আর তাহার পরিত্রাণ নাই।

বর্ত্তমান কালে একতন্ত্রের লোক ধর্ম্ম-তর্ক করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। বিচারের দ্বারা সত্যাসত্য নির্ণয় করা অবশ্য ভালই, বরং সে স্থলে তর্ক করা সঙ্গত হইলে আমাদের কিছু বলিবার থাকিত না। কিন্তু তাহারা নিয়তই তর্ক ও নিন্দা করিয়া বেড়ায়। অধিকাংশ স্থলে জয়ী না হইলেও তাহাদের ভ্রমের বা দোষের কথা প্রাণ থাকিতেও স্বীকার করে না। হায়! ইহারাই এখন অনেক স্থলে সমাজের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা পুরুষ।

তবে একটা সুবিধা এই যে, সাধারণ শ্রেণীর লোক ভিন্ন সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত লোকেরা তাহাদিগকে তৃণবৎও জ্ঞান করেন না। এখনও যে সমাজ জীবিত আছে, সে কেবল এই সমুদায় মহানুভবগণের অক্লান্ত চেষ্টায়।

পাঠকগণের মধ্যে কেহ যেন মনে না করেন যে, আমরা যুবা, ধনী বা তর্কপ্রিয় সামাজিকগণের পক্ষপাতি নহি, বা সমাজের নিয়ম (ঐশ্বরিক নিয়ম বিধি ব্যতীত) পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনের যে প্রয়োজন হয় না, তাহাও আমরা বলিতেছি না; বরং এই কলিযুগে সমাজের অনেক নিয়ম পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু করিবেন কে? যদি কেহ সমাজের কল্যাণার্থে কোনও সংস্কার বা হিতসাধনে প্রবৃত্ত হন, তবে তিঁনি সকলের সহানুভূতি অপ্রাপ্তেই বিফল মনোরথ হয়েন। এমন কি, সময়ে সময়ে অনেককে বহু লাঞ্ছনাও ভোগ করিতে দেখা যায়। এই লাঞ্ছনাকারী শ্রেণীর লোক সমুদায় সমাজের উন্নতির প্রধান কণ্টক। ইহারা কেবল ব্যক্তিগত নিন্দায় রত, পরের অনিষ্ট চিন্তাতেই ব্যস্ত সমস্ত এবং স্ব স্ব স্বার্থ সংরক্ষণে তৎপর। পর-দোষ অন্বেষণ করাই ইহাদের ব্যবসায়।

তবে এই স্থলে ইহাও বলা প্রয়োজন যে, যে সকল মহোদয় এরূপে সমাজের সংস্কার করিতে গিয়া লাঞ্ছিত ও অপমানিত হন, তাঁহাদেরও কিছু না কিছু ত্রুটি থাকিতে পারে। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে অহঙ্কৃত ও স্বার্থপর অনুমিত হয়। ইঁহারা সমাজ সেবায়

ব্রতী হইবার পূর্ব্বে যদ্যপি নিঃস্বার্থ ও নিরহঙ্কৃত হইয়া সকলের পরামর্শ গ্রহণে কার্য্যে অগ্রসর হন, তবে বোধ হয়, তাঁহাদের ইচ্ছাও ফলবতী হয়, এবং সমাজেরও অভাব অনটন দূরীভূত হয়।

আধুনিক শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে,—"সমাজ আবার কি? যে যাহা করিবে, তাহাই ত সমাজ। সকলকে যে কতকগুলি কঠিন নিয়মে আবদ্ধ থাকিতে হইবে, ইহার কোনও তাৎপর্য্য নাই।" এইরূপ যাহার যাহা ইচ্ছা, পিতৃমাতৃহীন সমাজের প্রতি স্বাধীন মন্তব্য প্রকাশ করিয়া আত্মপ্রসাদ ভোগ করিয়া থাকেন।

ফলতঃ সমাজ যেরূপ দ্রুত অধোগতি ও অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছে, এইরূপ গতিতে চলিলে শোচনীয় অধঃপতনের আর বড় অধিক বিলম্ব হইবে না। ভীরুতা, কাপুরুষতা, একাগ্রশূন্যতা, বিলাসিতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি বঙ্গবাসীর কলঙ্কিত অপবাদ সমূহ যে সমাজের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে আর সংশয় নাই।

সমাজ অর্থে ব্যক্তি সমষ্টি, এবং একতা অর্থে ব্যক্তি সমষ্টির সকল বিষয়ে সমভাব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে হইলে একতার বিশেষ আবশ্যক।

এখনও আমাদের সমাজ একবারে বিনাশ প্রাপ্ত হয় নাই; —এখনও এই অন্ন-বল-ইস্লাম-মধ্যে অন্তঃসলিলা নদীর ন্যায় যে একটি ক্ষীণ তেজঃ প্রবাহিত হইতেছে, তাহা আর কোথাও দৃষ্ট হয় কিনা সন্দেহ। এখনও লোকে সমাজের ভয়ে কু-কর্ম্ম করিতে ভীত হয়, বোধ হয় চেষ্টা করিলে এখনও ইহার গতি ফিরাইতে পারা যায়। উপযুক্ত ভিষকের ঔষধ পাইলে, মৃতপ্রায় জীবনেও সঞ্জীবনী-সুধার কার্য্য হইয়া থাকে।

জাতীয় জীবনের অভাব।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের শোচনীয় অধঃপতনের কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, জাতীয় জীবনের অভাবই আমাদের উন্নতি পথের প্রধান অন্তরায় এবং অবনতির মূলীভূত কারণ। সমগ্র ভারতে যত মুসলমানের বাস, যুক্তবঙ্গে প্রায় তাহার অর্দ্ধেক। বঙ্গীয় মুসলমানগণের সাধারণ আর্থিকাবস্থা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মুসলমান-গণের সাধারণ অবস্থা হইতে অনেকাংশে উন্নত ও স্বচ্ছল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শত সহস্র লোক বঙ্গদেশে আসিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিয়া প্রতিপালিত হইতেছে, কিন্তু এতদ্দেশীয় শ্রমজীবীদিগকে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে আর্থিকাভাব বিমোচন মানসে যাতায়াত করিতে দেখা যায় না। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এতদ্দেশীয় মুসলমানগণের সংখ্যাধিক্য এবং আর্থিকাবস্থার স্বচ্ছলতা সত্ত্বেও তাঁহারা উন্নতি পথ হইতে অপসারিত এবং অবনতি কূপের তমময় গহ্বরে পতিত, তাহার কারণ কি? পঞ্জাবের মুসলমানগণের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা আমাদের অপেক্ষা অনেক পরিমাণে উন্নত; লাহোরের আঞ্জমনে হেমায়তুল ইস্‌লামের জাতীয় কলেজ মুসলমানগণের গৌরবের সামগ্রী। ইস্‌লামীয়া কলিজিয়েট স্কুলের বর্ত্তমান ছাত্র সংখ্যা প্রায় ১৭০০। এতাধিক ছাত্রপূর্ণ স্কুল ভারতে বিরল বলিতে হয়। আঞ্জমনের কর্ত্তৃপক্ষ আশা করেন, তাঁহারা ছাত্রাবাসের সুবন্দোবস্ত করিতে পারিলে অনতিকাল মধ্যে স্কুলের ছাত্রসংখ্যা দ্বিসহস্রে পরিণত হইবে। এই আঞ্জমনের তত্ত্বাবধানে যে সকল বালিকা বিদ্যালয় আছে, সে সকলের ছাত্রীসংখ্যা

প্রায় ৮০০। তাঁহাদের পুস্তক প্রচার বিভাগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা আরবী, পার্সী, উর্দ্দু, ইংরেজী ও গুরুমুখী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় নানা প্রকার জাতীয় ভাবের পাঠ্য-পুস্তক রচনা করিয়া সমাজের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। পাঞ্জাব হইতে মুসলমানগণের বহুসংখ্যক সংবাদপত্র প্রচারিত হয়। তাঁহাদের মধ্যে দৈনিক পত্রেরও অভাব নাই। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের মুসলমানগণের বহু জাতীয় সদনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। লক্ষ্ণৌ নগরে নদ্‌ওতুল উলামার "দারুল উলুম" মুসলমান-গণের গৌরবের কীর্ত্তি। দিল্লীর "তেব্বিয়া মাদ্রাসা" বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। আলীগড়ের জাতীয় কলেজ ভারতের একটি স্মরণীয় কীর্ত্তির অন্তর্নিবিষ্ট। আলীগড় কলেজের ন্যায় এরূপ প্রকাণ্ড আড়ম্বরপুর্ণ বিদ্যামন্দির সর্ব্ববিষয় উন্নত হিন্দু সমাজের মধ্যেও নিতান্ত বিরল। উকীল ব্যারিষ্টার ও উচ্চ রাজ-কর্ম্মচারীদিগের তুলনায়ও পাঞ্জাব এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশের মুসলমানগণ আমাদের অপেক্ষা উন্নত। দিল্লীর মুসল-মানগণ বাণিজ্য ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশ উন্নতি লাভ করিয়াছে। কলিকাতার কলুটোলা, সিন্দুরিয়াপট্টি ও ক্যানিং ষ্ট্রীটে যে কয়টি মুসল-মানগণের উল্লেখযোগ্য দোকান আছে তাহার অধিকাংশই দিল্লীবাসীদের। বোম্বায়ের মুসলমানগণ ব্যবসায় বাণিজ্য ক্ষেত্রে ভারতের অন্যান্য বাণিজ্য-প্রিয় উন্নত জাতি সমূহের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছেন। মান্দ্রাজের মুসলমানগণও বাণিজ্য ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত উন্নত। কিন্তু বঙ্গীয় মুসলমান-গণের অবস্থা সর্ব্বদিকেই শোচনীয়।

বঙ্গীয় মুসলমানগণের ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থা ও অধঃপতনের কারণ জাতীয় জীবনের অভাব ব্যতীত আর কিছুই নহে। সমাজগত স্বার্থের বিনি-ময়ে ব্যক্তিগত স্বার্থকে বলিদান করিতে পারে,এরূপ লোক বঙ্গীয় মোস্‌লেম সমাজে নিতান্ত বিরল। প্রকৃত স্বজাতি বাৎসল্য ও সমাজ হিতৈষণা

আমাদের মধ্যে নাই বলিলেও চলে। যে পর্য্যন্ত সামাজিক ও দেশহিতকর কার্য্যকে নিজের ব্যক্তিগত কাজ হইতে অগ্রগণ্য না করিবে, যে পর্য্যন্ত নিজের পুত্র কন্যার অভাব অভিযোগ অপেক্ষা দেশের ও সমাজের অভাব অভিযোগের গুরুত্ব অধিক বলিয়া জ্ঞান না করিবে, যে পর্য্যন্ত নিজে আহার না করিয়া অনশন কাতর ব্যক্তির মুখে অন্ন উঠাইয়া দিবার প্রবৃত্তি না জন্মিবে, স্বজাতি ও স্বদেশের কল্যাণ কামনায় নিজের যথা সর্ব্বস্ব বির্জ্জন দিতে শিক্ষা না করিবে, দেশের ও দশের ক্ষতিকে যে পর্য্যন্ত নিজের ক্ষতির তুলনায় অধিক অনিষ্টকর মনে না করিবে, সে পর্য্যন্ত কোন জাতির জাতীয়জীবন সঞ্জীবিত হইতে পারে না এবং অধঃপতিত জাতির উদ্ধার সাধিত হওয়াও সম্ভবপর নহে।

ব্যক্তিগত স্বার্থের পরিবর্ত্তে জাতিগত ও দেশগত স্বার্থের প্রাধান্য রক্ষা করার দৃষ্টান্ত সমুদায় উন্নত ও সৌভাগ্যবান জাতির ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতে ইংরেজ জাতির প্রতিপত্তি ও পরিশেষে রাজত্ব লাভ করার মূল সূত্র অনুসন্ধান করিলে ইতিহাসে ইংরেজ জাতীর জাতীয় জীবন ও জাতীয় সহানুভূতির একটি অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সম্রাট্ শাহ্‌জাহানের এক প্রিয়তমা কন্যার গুরুতর পীড়ার চিকিৎসার জন্য সুরাট হইতে ইংরেজ বণিক দলের "বটন" নামক জনৈক ডাক্তার দিল্লীতে আহুত হন। ডাক্তারের সুচিকিৎসা ও দয়াময়ের কৃপায় রাজ-কুমারী আরোগ্য লাভ করিলে প্রাচ্য দেশের রাজন্যবর্গের নিয়মানুসারে এরূপ ক্ষেত্রে ডাক্তারের ভাগ্যে লক্ষ লক্ষ স্বর্ণ রৌপ্যঃ মুদ্রা, চিরস্থায়ী জায়গীর বা নিষ্কর ভূসম্পত্তি লাভ এবং নানাবিধ বহু মূল্যের খেলাত পাওয়া স্বাভাবিক ছিল। সম্রাট্ ডাক্তার সাহেবকে বহু ধন রত্ন ও অশ্ব হস্তী প্রভৃতি বহু মূল্যের দ্রব্যাদি দ্বারা পুরস্কৃত করিতে উদ্যত হইলে, স্বজাতি বৎসল স্বদেশ প্রেমিক ডাক্তার

ব্যক্তিগত স্বার্থকে স্বীয় জাতিগত স্বার্থের বিনিময়ে বিসর্জ্জন দিয়া সম্রাটের নিকট সসম্মানে প্রার্থনা জানাইলেন যে, সম্রাট্ যেন ইংরেজ বণিকদিগকে বঙ্গদেশে বিনাশুল্কে বাণিজ্যাধিকার প্রদান করেন। সম্রাট্ তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। ডাক্তারের অনুরোধে ইংরেজ বণিক সম্প্রদায় বিনাশুল্কে বঙ্গে বাণিজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইলেন; ডাক্তার ব্যক্তিগত বহুমূল্যের স্বার্থকে জাতীয় স্বার্থের বিনিময়ে বলিদান করিলেন। ইহাকেই বলে জাতীয় সহানুভূতির নিদর্শন এবং জাতীয় জীবনের জীবন্ত ছবি।

হজরত মোহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁহার সহচরবর্গের জীবনীতে এরূপ ত্যাগ স্বীকার ও ব্যক্তিগত স্বার্থকে জাতিগত ও দেশগত স্বার্থের বিনিময়ে বলিদানের দৃষ্টান্ত বহুল পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়। কথিত আছে, হজরত মোহাম্মদ একবার উপর্য্যুপরি সাত দিবস অনশনে যাপন করেন। তদীয় কন্যা ফাতেমা দেবী ও তাঁহার হৃদয়রত্ন দৌহিত্র হজরত হাসন ও হোসাইন সকলেই অন্নাভাবে উপবাস যন্ত্রনায় ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন। তিনি এক ঈহুদীর বাড়ী কূপ হইতে জল উত্তোলনের পারিশ্রমিক স্বরূপ কিঞ্চিৎ খর্জ্জুর লাভ করিয়া তৎসহ গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন, এমন সময় এক ভিক্ষুক আসিয়া হাঁক দিল। হজরত বহুপরিশ্রম অর্জ্জিত খর্জ্জুর রাশি অম্লান বদনে সেই ভিক্ষুককে দান করিয়া স্বয়ং সপরিবারে উপবাসী থাকিলেন। একদা সন্ধ্যার সময় তিনি কতিপয় সহচরবর্গের সহিত কথোপথন করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি পথিক আসিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিল। তিনি সকলের দিকে পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, কিন্তু উপস্থিত সকলেরই অন্নাভাব হেতু কেহ মুখ ফুটিয়া পথিককে আশ্রয় দিবার অভিপ্রায় জানাইলেন না। তিনি পুনরায় তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন একজন সহচর-বন্ধু পথিককে নিজ বাসায় লইয়া গেলেন। তাঁহার গৃহে সামান্য এক ব্যক্তির পরিমাণ খাদ্য বিদ্যমান ছিল। গৃহস্বামীর ইঙ্গিতে তাঁহার পতিব্রতা

স্ত্রী শিশু সন্তানদিগকে নানারূপ সান্ত্বনা দিয়া কৌশলে ঘুম পাড়াইলেন। স্বামীর আদেশ মতে অতিথির সম্মুখে ঢাক্‌না দ্বারা আবৃত করিয়া খাদ্য আনিয়া উপস্থিত করিলেন। গৃহলক্ষ্মী খাদ্য দিয়া ফিরিয়া যাইবার সময় স্বামীর ইঙ্গিতানুসারে বস্ত্রাঞ্চলের বাতাসের সাহায্যে প্রদীপ নিবাইয়া দিলেন। অগত্যা অন্ধকারের মধ্যে অতিথিকে আহার করিতে হইল। গৃহ স্বামী সঙ্গে বসিয়া এরূপ ভাব দেখাইতে লাগিলেন যে, তিনিও যেন তাহার সহিত আহার করিতেছেন। আর পুনঃ পুনঃ মোসাফেরকে খাওয়ার জন্য অনুরোধ করিতেছিলেন। তিনি জানিতেন যে নিজে সেই সামান্য খাদ্যের অংশ গ্রহণ করিলে অতিথির তৃপ্তি সাধিত হইবে না। তাই তিনি পরিবারের সকলকে অভুক্ত রাখিয়া এবং নিজেও উপবাসী থাকিয়া আতিথ্য সৎকার সম্পাদন করিলেন, অথচ অতিথিকে জানিতে দিলেন না যে তাহারা সকলে উপবাস করিয়াছেন। জাতীয় জীবন ইহাকেই বলে। হজরত আবুবাকর ও হজরত উমরের জীবনীতে বহু আদর্শ দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। হজরত উমর আরব, সিরিয়া, পারস্য ও মিসরের অধিপতি ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পরিধেয় জীর্ণ বস্ত্রে তালি ও সিলাইর অন্ত ছিল না। তিনি সম্রাট্‌রূপে জেরুসালেম গমনকালে কতকদুর তিনি উষ্ট্র পৃষ্ঠে আরোহণ করিতেন ভৃত্য উষ্ট্রের নাসাগ্রের রশি ধরিয়া উষ্ট্রকে চালিত করিত আর কতকদুর ভৃত্যকে উষ্ট্র পৃষ্ঠে বসাইয়া তিনি স্বয়ং উষ্ট্রের নাসা রজ্জু ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেন। সাম্য মৈত্রী, একতা ও জাতীয় জীবনের ইহা অপেক্ষা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে? ত্যাগ স্বীকার আর কাহাকে বলে? যে পর্য্যন্ত বর্ত্তমান মুসলমানগণের মধ্যে এরূপ ভাব জাগরিত না হইবে, তাহারা নিজের স্বার্থাপেক্ষা জাতিগত স্বার্থকে অগ্রগণ্য জ্ঞান না করিবে, তাবৎ এই পতিত জাতির উদ্ধার সাধিত হইবে না।

ধর্ম্মহীনতাই অবনতির কারণ।

তৃতীয় প্রস্তাব।

ধর্ম্ম সংরক্ষণই সকল প্রকার উন্নতির মূল। ধর্ম্মগ্রন্থির শিথিলতায় কর্ম্মহানি ঘটিয়া থাকে; এবং তাহার বিষময় ফলে ভীষণ নারকীয় পথ আবিষ্কৃত ও পরিষ্কৃত হয়।

এই নারকীয় পার্থিব দৃশ্য—অবনতি। অবনতি হইতে শোক দুঃখ, তাপ জ্বালা, যন্ত্রনা নানা প্রকার উপদ্রবের উৎপত্তি হয়। মনুষ্য—মনুষ্যো-চিত কার্য্য করিতে না পারিলে ধর্ম্মের ব্যত্যয় জন্মে, এবং এরূপ স্থলে আত্মোন্নতি সম্পূর্ণ অসম্ভব।

পূর্ব্বে পণ্ডিত (আলেম) গণ, ধর্ম্ম প্রতিপালনে তৎপর ছিলেন। পরম পবিত্র স্বর্গীয় মহাগ্রন্থ "কোরান-শরীফ" তাঁহাদের জীবন-আদর্শ এবং নিত্য কর্ম্মান্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং ইহাই পণ্ডিতদিগের ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইত। পণ্ডিতেরা সেই মহাগ্রন্থের অনুগত হইয়া নানাপ্রকার শাস্ত্র গ্রন্থের অনুশীলন করিয়া যে জ্ঞান অর্জ্জন করিতেন, তদ্দ্বারা ধর্ম্মের সকল কর্ম্ম যথানিয়মে প্রতিপালিত হইত।

অধুনা এরূপ ধর্ম্ম প্রতিপালন-প্রথা দেশে বিরল। পণ্ডিত ধুরন্ধরগণ সকলেই এখনকার দিনে সমভাবাপন্ন। সকলেই স্ব স্ব প্রধান; সুতরাং মতামতে, বিধি ব্যবস্থাতে কেহ কাহারও অধীনতা স্বীকার করিতে চান না। ইহাতেও দেশের ভয়ানক দুর্দ্দশা ঘটিতেছে।

বস্তুতঃ, ধর্ম্ম-বিচ্যুতিই সকল প্রকার কর্ম্মহানির মূল; এবং তাহা হইতে মনুষ্যকে সর্ব্ব প্রকার পাপে পতিত হইতে হয়। আমরা ত সামান্য মানব,—দূরের কথা; বিশ্বপাতা বিধাতার ক্ষুদ্র আদেশে অনাস্থা প্রদর্শন করায় আদিপিতা হজরত আদম স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে বিতাড়িত হন; এবং

তিনশত বৎসর অহর্নিশি রোদন নিবেদনের পর মুক্তিলাভে শান্তি প্রাপ্ত হন। আবার স্বর্গীয় শ্রেষ্ঠ ফেরেস্তা মক্‌রোম—যে নাকি সমস্ত দূতগণের মহা গুরু ছিল, একটি মাত্র আদেশে অবহেলা প্রদর্শন করিয়াই "শয়তান" নামে অভিহিত হইয়া স্বর্গচ্যুত হইয়াছে। এরূপ স্থলে আমরা ত তুচ্ছ মানুষ সম্পূর্ণ অধর্ম্ম প্রণোদিত হইয়া যে দিন দিন রাশি রাশি পাপ সঞ্চয় করিতেছি, ইহাতে আমাদের বর্ত্তমান অমঙ্গল সম্ভবপর নয় কি ?

এখন কেন আমরা অধর্ম্মে প্রণোদিত হইতেছি, তাহার একটু আলোচনা করা যাউক।

নৈতিক শিক্ষা, ধর্ম্মার্জ্জনের প্রধান সহায়। প্রাথমিক শিক্ষায় ধর্ম্মোপদেশ না পাইলে হৃদয় যে সম্পূর্ণ ধর্ম্মভাব পরিশূন্য হয়, তাহা অবশ্যম্ভাবী। আমাদের হৃদয়ে যখন ধর্ম্ম-জ্ঞান প্রবল ছিল, তখন আমরা প্রাথমিক শিক্ষাও তদনুরূপ পাইতাম। বিজাতীয় দেশে কিম্বা ধর্ম্মময় প্রদেশে ধর্ম্মমূলক পুস্তক পাঠ করিয়া,—পিতৃ পিতামহের নিকটে সর্ব্বদা ধর্ম্মময় উপদেশ শুনিয়া, সাংসারিক সর্ব্ববিধ ক্রিয়া কলাপে তাঁহাদিগকে ধর্ম্মপ্রাণ দেখিয়া আমরাও ধার্ম্মিক শ্রেণীতে পরিগণিত হইতাম। এই নিয়মে পূর্ব্বে ধর্ম্ম প্রতিপালিত হইত।

অধুনা এরূপ শিক্ষা সমাজ হইতে, দেশ হইতে একবারে বিতাড়িত হইয়াছে। এখন আমরা যাহা কিছু করিয়া থাকি, তাহার সকলগুলিতেই যে এইরূপ শিক্ষার প্রয়োজন, তাহা আমরা উচিত বলিয়াই বিবেচনা করিনা।

পূর্ব্বে অল্পবয়স্ক বালকের কণ্ঠে নীতিপূর্ণ শ্লোক উচ্চারিত হইত, এবং কোরান-শরীফ ও হাদিস-শরীফ তখনকার দিনে সকলের পক্ষেই প্রধান শিক্ষনীয় বিষয় ছিল। শিশুগণ দাস দাসীর—বৃদ্ধ পিতামহ পিতামহীর ক্রোড়ে শায়িত হইয়া পুণ্যাত্মা মনস্বিগণের অল্প বিস্তর উপাখ্যান শ্রবণ

করিত। লেখা পড়া শিখিয়া তাহারা সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিত। আর আজ কাল এই উন্নতির যুগে, উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষালাভ আশায় বয়সের অর্দ্ধভাগ কাটাইলেও সেইরূপ স্বচ্ছলতার কণামাত্রও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিতেছেনা।

পূর্ব্বে আমরা লেখা পড়া শিখিতাম জ্ঞানার্জ্জনের জন্য, সুতরাং তখন আমাদের পাঠ্য পুস্তকগুলিও তদ্রূপ নির্দ্দোষ হইত। এখনকার দিনে অর্থকরী বিদ্যা হইয়াছে,—বি, এ,—এম, এ, পাশ করিব, উকিল হইব, হাকিম হইব, দেশের কিছু করিতে পারি বা না পারি অর্থো-পার্জ্জনে স্বকীয় উন্নতি সাধন করিব, নৈতিক শিক্ষার পরিবর্ত্তে আজ কাল ইহারই জন্য আমরা বিদ্যাশিক্ষা করিয়া থাকি।

পূর্ব্বের লোকে জানিতেন, লেখা পড়া শিখিলে প্রত্যহ কোরান-শরীফ ও দোওয়া দরুদ পাঠ করিতে হয়, যথানিয়মে রোজা নামাজ করিতে হয়; যাহাতে পাপ সংস্পর্শ ঘটে, ভ্রমেও এরূপ কার্য্য করিতে নাই। কিন্তু আজ কাল দেখা যায়, যাহারা উচ্চ শিক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই নামাজ, রোজা, প্রভৃতির ধার ধারেন না। বরং যাহারা মুর্খ, তাহাদেরই এদিকে অধিক মতি গতি আছে।

সৎপথে অর্থোপার্জ্জন করিয়া, এবং সেই অর্থের সদ্ব্যয় পূর্ব্বক জীবন-যাত্রা নিঃশেষ করাই তখনকার দিনের শিক্ষিত ব্যক্তির কর্ত্তব্য ছিল। এখন কি তাহাই আছে? উপরন্তু এখন আমরা ঘোর বিলাসী হইয়া পড়িয়াছি। বেশ বিন্যাসের অল্পমাত্র হানি হইলে ভদ্র সমাজে গমন করিতে আমাদের কেমন একটা লজ্জা আসিয়া উপনীত হয়। সুতরাং সর্ব্বদা বিলাসের উপকরণ সংগ্রহেই আমরা ব্যস্ত। আমাদের স্ব-ধর্ম্ম প্রতিপালনের অবকাশ কৈ? আমাদের ধর্ম্ম পালন করিতে গেলে বিলাস-বাসনা পূর্ণ হয় কৈ? পক্ষান্তরে আবার সনাতন ইস্লামধর্ম্ম

সম্পূর্ণরূপে বিলাসিতা পরিশূন্য। * সুতরাং স্বধর্ম্ম নিরত হইলে ভদ্র বলিয়া পরিচিত হওয়া চলে কি প্রকারে? এই তো হইয়াছে অবস্থা। এই অবস্থার ভাবী ব্যবস্থা কিরূপ হইবে, তাহা কিন্তু কেহই ভাবিতে চাননা, ইহাই সমধিক দুঃখের বিষয়।

আমরা যে দিন দিন দরিদ্র হইয়া পড়িতেছি, যাহার যাহা ইচ্ছা হয় বলুন, আমরা কিন্তু এই ধর্ম্মহীনতাই ইহার একমাত্র মূল কারণ বলিয়া মনে করি। ধর্ম্মজ্ঞান বিবর্জ্জিত মানুষ প্রকৃত কর্ম্মের অধিকারী হইতে পারেনা; সুতরাং এই বিলাসিতা হইতে আমাদের যে দারিদ্র্যতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, অল্পমাত্র চিন্তা করিলেই তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়।

পূর্ব্বে জমিদার সরকারে যাহারা ৬৲ টাকা বেতনের মোহরের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, ধর্ম্মমূলক সকল কর্ম্মই তাহারা করিতে পারিত। এখনকার দিনে ৪০০৲ চারিশত টাকা বেতনের ডেপুটি বা ১২০০৲ বার শত টাকার ম্যাজিষ্ট্রেটগণ সেরূপ করিয়া থাকেন কি? পূর্ব্বের ছয় টাকা বর্ত্তমান সময়ের ছয় শতের সমতুল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তখন ধর্ম্মজ্ঞানে বিন্দুমাত্রও বিলাসিতা ছিল না; সুতরাং যাহা উপার্জ্জন হইত, তাহাতেই বেশ কুল কিনারা হইত। এখন পদমর্য্যাদার দায়ে——মান সম্ভ্রম বজায় রাখিতে হইলে আয় অপেক্ষা ব্যয়ের মাত্রা বাড়িয়া উঠে—— ইহাই আধুনিক কালের সর্ব্বনাশের কারণ। ফল কথা, দেশ হইতে ধর্ম্মকর্ম্ম লোপ প্রাপ্তিই দেশের অবনতির কারণ।

রাজনীতি এবং অন্যান্য বাজে বিষয়ের আলোচনাপেক্ষা দেশীয় পত্রিকাগুলি ও সমাজ-হিতৈষী মহাত্মগণ যদি এখন ধর্ম্মনীতির পর্য্যালোচনায় অধিকতর মনোযোগী হইতেন, তবে এ হতভাগ্য দেশের প্রভূত উপকার সাধিত হইবার সম্ভাবনা ছিল।

---

* "মদিনা-শরীফের ইতিহাস" দ্রষ্টব্য।

আলস্যপরায়ণতা ও অনুকরণ-প্রিয়তাই সর্ব্বনাশের মূল।

চতুর্থ প্রস্তাব।

যাঁহারা অসূল, ফেকাহ্, বালাগাৎ, শিল্প, রসায়ন, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, খগোল, চিত্র বিদ্যা, ভাস্কর বিদ্যা, ধাতু বিদ্যা, ভৈষজ্য, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি ও চিকিৎসা প্রভৃতিতে জগতে অদ্বিতীয় ছিলেন,—চারু কারুকার্য্যে ময়ূর সিংহাসন, জামে মস্‌জেদ, মতি মস্‌জেদ, তাজমহল, কুতুবমিনার, মতিঝিল, কাস্‌রুল, জহুরা, আল্‌হামরা ইত্যাদি নির্ম্মাণে নিখিল জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করত চিরানন্দময় স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও আশা ভরসা, হাসি কান্না, অশ্রু স্নেহ, প্রেম-ভালবাসা উৎসাহ উদ্যম, চেষ্টা যত্ন, জ্ঞান বল সমুদায়ই চিরতরে অন্তর্হিত হইয়াছে। এখন আমরা তদ্বিনিময়ে আলস্য, অনুকরণ, বিলাসিতা, স্বার্থপরতা এবং আত্ম-বিচ্ছেদের প্রশ্রয় দিতেছি। তাঁহারা অমিত তেজসম্পন্ন পুরুষ সিংহ ছিলেন,—আর তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন। হায়! আজকাল কৃতঘ্ন সংসারের পৃষ্ঠ হইতে তাঁহাদের নাম পর্য্যন্তও মুছিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের স্মৃতি-মন্দির আমাদের তাপদগ্ধ হৃদয়ে চিরদিন পূর্ণরূপে প্রকটিত থাকিবে। বিশ্ববাসী আজিও সেই যশস্বী মহানুভব পুরুষদিগের অক্ষয় কীর্ত্তির প্রবল প্রতাপে আত্মহারা! দিশাহারা!!

যাক্, অতীত স্মৃতির আলোচনা করিয়া পাঠকগণের মনে বেদনা বৃদ্ধি করিব না, বুদ্ধি বিপর্য্যয়ে আমরাই আমাদের সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছি; আমরাই আমাদের চরণযুগলে কুঠারাঘাত করিয়াছি,—আর আজ দিন-কাণার ন্যায়

লক্ষ্যহারা, দিশাহারা হইয়া ঘুরিতেছি। পাঠক, আসুন এখন একবার অতীতের সহিত বর্ত্তমানের তুলনা করিয়া দেখি, এহেন অপূর্ব্ব "যুগল মিলন" কেমন সুন্দর!

আধুনিক বঙ্গীয় সমাজ হইতে ধর্ম্মকর্ম্ম, আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, শিল্প বাণিজ্য একে একে সমুদায়ই চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে। সৎ শিক্ষার অভাবে, প্রবল বিজাতীয় প্রতিযোগিতায়—দারিদ্রতার কঠোর কষাঘাতে, চিন্তাশীলতার অভাবে আমরা এখন আর জাতীয় জ্ঞান, বিজ্ঞান চিন্তনে সমর্থ নহি।

আমরা শৈশবকাল হইতে বিজাতীয় মন্ত্রেতন্ত্রে দীক্ষিত হইতেছি,—বিজাতীয় আচার ব্যবহার, রীতি নীতি প্রভৃতির অনুকূল তর্ক শ্রবণে আজীবন ক্ষেপণ করিতেছি। বিজাতীয় অনুকরণে এতদূর মুগ্ধ হইয়াছি যে, জাতীয় একটি যৎসামান্য বিষয়ও আমাদের হৃদয়ে আর স্থান লাভ করিতে পারিতেছে না। আমাদের যাহা কিছু আছে; তাহা যেন ধর্ম্মজ্ঞানানুমোদিত নয়, সকলই অজ্ঞানতা এবং কুসংস্কার মূলক—বাল্যকাল হইতেই আমাদের হৃদয়ে এই বীজ বপন করা হইতেছে। সুতরাং আমরা জাতীয় কোনও কর্ম্মে সদসৎ বিচার ব্যবস্থা না করিয়াই যাহা তাহা সমাধা করিয়া পশ্চাৎ ফেলিতেছি। এই যে আমরা দরিদ্র আলেম (পণ্ডিত) প্রচারকদিগকে যত্ন ও আদর অভ্যর্থনা করিতেছি না—পিতা মাতা গুরুজনকে ভক্তি শ্রদ্ধা, সেবা শুশ্রূষা করিতেছি না—এই যে আমরা আমাদের অশন বসনের দোষ উদ্‌ঘাটন করিতেছি, এবং জাতীয় আচার ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেছিনা, ইহা কি আমাদের গভীর গবেষণার ফল? না, জাতীয় বিষয়ে চিন্তা শূন্যতার পরিচায়ক?

আমরা বাল্যকাল হইতে ক্লাইবের কাহিনী—কবে পলাশী বাগানে আমাদের মুণ্ডপাত করিয়া তিনি চাতুরীর পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন,

তাহার বাহাদুরী পড়ি, মোস্লেম-দ্বেষী পিশাচাত্মা নরাধম লেখকদিগের কাব্য উপন্যাস পাঠ করি। কিন্তু বল তো দেখি, কয়জন আমাদের মধ্যে জগদারাধ্য হজরতের চরিতামৃত জ্ঞাত আছি ? না, আমরা তাহা, করিব কেন, ততক্ষণ বঙ্কিমের সাধের উপন্যাস, নবীনের সখের কাব্য পাঠে উপহাস ও রহস্য উদরস্থ করিতে করিতে জীবন প্রাণ সার্থক করিব। এই না দাঁড়ায়েছে এখন আমাদের দৈনিক কর্ত্তব্য কর্ম্ম ?

আমরা জাতীয় কোনও বিষয় চিন্তা করিলামনা, আমাদের ধর্ম্ম জগতে যে কি কি রত্ন নিহিত আছে, তাহারও একবার অনুসন্ধান লইলামনা,—দেখিলামনা। অথচ আমাদের ধর্ম্ম-ভাণ্ডারে যে "কিছুই নাই" এই মিথ্যা কুসংস্কার আমাদের মনে বদ্ধপরিকর হইতেছে।

যে সকল সত্যের উপর নির্ভর করিয়া—যে আলোকে বিচরণ করিয়া আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ যুগ যুগান্তর কাল সুস্থ শরীরে আনন্দচিত্তে দীর্ঘ জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, এখনও সেই সমুদায় (হাকিমী ঔষধ) বর্ত্তমান আছে। কিন্তু আমাদের সে সকলে বিশ্বাস স্থাপন করিতে রুচি হইতেছে কৈ ?

আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের জ্ঞান চিন্তা, চেষ্টা যত্ন, উদ্যম পরিশ্রম আমাদের ন্যায় কুলাঙ্গারদিগের জন্য সমুদায়ই মিথ্যায় পরিণত হইয়াছে। আমাদিগকে বিজাতীয় আলোক মোহ-মায়া-জালে এমনি চক্ষু ঢাকিয়া ফেলিয়াছে যে, এক্ষণে পথ-ভ্রষ্ট পথিক তুল্য পাশ্চাত্যালোকের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমাভিমুখী হইয়া ধীরে ধীরে ডুবিয়া যাইতে প্রস্তুত হইয়াছি। আমাদের জাতীয় জিনিষ বা মানুষে আর জাতীয় উপকারের আশা প্রত্যাশা আদৌ নাই। বর্ত্তমান কালে বঙ্গীয় মোস্লেমগণ পণ্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞ মহাত্মাদিগের কিছুই ধার ধারে না ; বরং সাক্ষাৎ দর্শনেও লজ্জা এবং কেমন কেমন একটা বাঁধ আসিয়া পরিয়াছে।

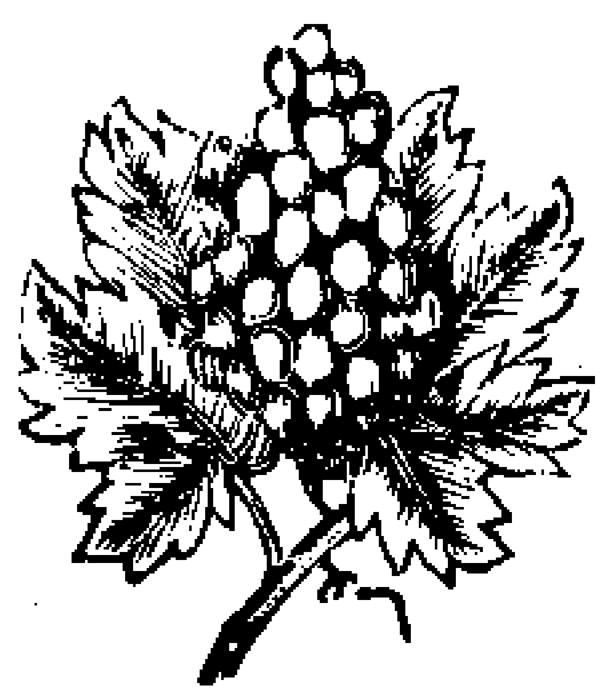
এখন বঙ্গীয় মোস্লেমগণ ধর্ম্মঋণ, পিতৃঋণ, মাতৃঋণ, ভ্রাতৃঋণ, গুরুঋণ হইতেও যেন একবারে চিরমুক্ত হইয়া বসিয়াছে। পিতামাতার অর্থ নীতির জ্ঞান নাই দেখিয়া, বিশেষতঃ পাছে পিতা অপর সন্তানদিগকে তদীয় অর্জ্জিত ধনে সাহায্য করেন, তাই সে আর পিতা মাতাকেও অন্ন দিতে প্রস্তুত নহে। ভ্রাতা তাহার ন্যায় গুণবান ও পরিশ্রমী নয় বলিয়া তাহাকেও এক অন্নে রাখিতে প্রস্তুত নয়।

এমনই একদিন—এক আলোক আসিয়াছে যে, কে আত্মীয়, কে স্বজন তাহাই এখন আমরা চিনিতে পারিতেছি না। যাহা কিছু জাতীয় সবই আমাদের চোখে আজকাল বিষবৎ প্রতীত হইতেছে। এমন কি, আধুনিক কালে পিতা মাতাকেও বাড়ী হইতে তাড়াইয়া কুকুর পুষিয়া বদন হইতে কীট বাছিতে বসিয়াছি। অনেকে পিতা মাতার ঋণ উপেক্ষা করিয়া চিত্ত বিনোদিনী ভার্য্যারত্ন এবং আদুরে শ্যালক শ্যালী লইয়া আমোদে প্রমোদে জীবন যাপন করিতেছে।

যে যে কারণে জনপদ ধ্বংস হয় বলিয়া শাস্ত্রে লিখিত আছে, বঙ্গের মোস্লেম সমাজে ঠিক সেই সমুদায় লক্ষণ সমুপস্থিত হইয়াছে! আজ কাল গুরু, বৃদ্ধ, প্রচারক ধর্ম্ম-পণ্ডিতগণের পদে পদে অবমাননা। সকলেই সকলকে অভিসম্পাত করিতেছে। এই অধঃপতিত সমাজে কাহারও প্রতি কাহারও সহানুভূতি নাই—শুভ ইচ্ছা নাই। কোন কোন স্থলে পরম শুভানুধ্যায়ী পিতা মাতারও আর সন্তানের প্রতি সম্পূর্ণ শুভাশীর্ব্বাদ নাই। ভ্রাতার প্রতিও ভ্রাতার শুভবাসনা ও পূর্ণ ভালবাসা নাই। অতিথি-গণও গৃহস্থের শুভকামনা করে না। প্রতিবাসীও পরস্পর পরস্পরকে ঈর্ষার নয়নে দেখিতেছে। কাহারও প্রতি কাহারও শুভ ইচ্ছা বা সহানুভূতি না থাকিলে, শ্রদ্ধা যত্ন না থাকিলে, তবে ভ্রাতৃগণ! আমরা তিষ্ঠিব কি প্রকারে?

যখন সমাজে কাহারও জ্ঞানে কাহারও প্রয়োজন হয় না, কাহারও শ্রম বা বৃত্তিকে কেহই সমাদর করে না, পরস্পরের স্নেহ ভালবাসা কিছুই থাকে না, তখন সেই সমাজ রোগ শোক এবং দুঃখ দারিদ্র্যে মুহ্যমান হইয়া উৎসন্ন হইতে থাকে। আমরা হতভাগ্যদের অদৃষ্টেও বাস্তবিক তাহাই ঘটিয়াছে। এই যে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ, ওলাউঠা এবং বসন্ত ও প্লেগ প্রভৃতি রোগে উৎপাত করিতেছে, ইহা সমাজ যে উৎসন্নতার পথে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছে, তাহার পূর্ব্ব লক্ষণ নয় কি ?

হায়! সমাজ ছাড়িয়া ক্রমে ক্রমে সকলই বিদায় গ্রহণ করিতে চলিল। আমরা ফরাসে তাকিয়া হেলান দিয়া হুকার নল মুখে লইয়া আকাশের নক্ষত্ররাজি গণনা করিতেছি; এবং বড় বড় উপাধি লইবার যোগাড় যন্ত্র করিতেছি। এখনও সময় আছে,—প্রাণপণ চেষ্টা করিলে সুফল ফলিবার আশা, দুরাশা নয়।



শিক্ষা।

পঞ্চম প্রস্তাব।

শিক্ষাই মনুষ্যের যাবতীয় উন্নতির মূল। শিক্ষা ভিন্ন জগতে কোন জাতিই উন্নতি লাভে সমর্থ হয় নাই। পৃথিবীতে যত লোক উন্নতি শিখরে অধিরোহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই শিক্ষিত ছিলেন।

শিক্ষা দুই প্রকার, সুশিক্ষা ও কুশিক্ষা। যে শিক্ষা লাভ করিয়া মানুষ নিজের, সমাজের ও স্বদেশের উন্নতি লাভে সমর্থ হয় এবং স্বীয় জীবনকে পবিত্র, উন্নত এবং প্রতিভাশালী করিয়া মানব জীবনকে সার্থক করিতে পারেন, সেই শিক্ষাই সুশিক্ষা বা প্রকৃত শিক্ষা নামে অভিহিত হইতে পারে। আর যে শিক্ষা দ্বারা নিজের জীবনের, সমাজের, স্বদেশের এমন কি জগতের কোন প্রকার অনিষ্ট বৈ ইষ্ট লাভ হয় না, তাহাকেই কুশিক্ষা নামে অভিহিত করা যাইতে পারে।

প্রত্যেক মানব সন্তানেরই কর্ত্তব্য যে, সকলেই সুশিক্ষা দ্বারা হৃদয় মন্দিরকে সুশোভিত করিয়া ঈশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্য সুসম্পন্ন করত তাহার জীবনকে পবিত্র ভাবে সৎপথে পরিচালিত করেন এবং ঈশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্য হইতে দূরে থাকিয়া নিজের আত্মাকে কলুষিত হইতে না দেন। ইহা ঈশ্বরের বাণী।

সুশিক্ষা ভিন্ন কি আধ্যাত্মিক উন্নতি কি দৈহিক উন্নতি কি পারলৌকিক উন্নতি কিছুই করিতে সমর্থ হওয়া যায় না। পৃথিবীতে যত প্রকার ব্যবসায় আছে, সুশিক্ষা ব্যতীত একটিও উন্নত হইবার নহে। জেমশেঠজী টাটা যদি বাণিজ্য বিষয়ে সুশিক্ষিত না হইতেন, তাহা হইলে তিনি বাণিজ্যে তাদৃশ উন্নতি লাভে সমর্থ হইতেন ? নেপোলিয়ান যদি

সমরনীতি বিষয়ে সুশিক্ষিত না হইতেন, তাহা হইলে কি তিনি পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয় বীর বলিয়া গণ্য হইতে পারিতেন? ডেক যদি নৌ বিদ্যায় শিক্ষিত না হইতেন, তাহা হইলে কি তিনি পোত লইয়া পৃথিবী ভ্রমণ করিতে সমর্থ হইতেন? এইরূপ প্রত্যেক কার্য্যের জন্যই শিক্ষার প্রয়োজন। এইজন্য বলিয়াছি,—শিক্ষাই যাবতীয় উন্নতির মূল।

যিনি শৈশবে ও বাল্যকালে কোমল হৃদয়ে সুশিক্ষার বীজ বপন করেন, তিনি যে কালে একজন উন্নতিশীল ব্যক্তি হইবেন, তিনি যে পিতা মাতার সুপুত্র মধ্যে পরিগণিত হইবেন, তিনি যে স্বকীয় অমূল্য মানব জীবনকে সার্থক করিতে সমর্থ হইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শিক্ষিত ব্যক্তির পবিত্র হৃদয়ের নিকট স্বর্গীয় অমরাবতীও পরাস্ত। তাঁহার হৃদয়ের এক একটি সঙ্কল্প নন্দন-কাননের সুগন্ধিময় পারিজাত। তাঁহার হৃদয় শারদীয় পূর্ণচন্দ্র সদৃশ বিমল আভাময়! তাঁহার অন্তকরণ সদুপদেশরূপ অমৃতের নির্ঝরিণী! তাঁহার সেই অমৃত-নির্ঝরিণী তুল্য হৃদয়ের নিকট স্বর্গীয় মন্দাকিনীধারাও পরাভব স্বীকার করে। তাঁহার হৃদয় ভাণ্ডার সর্ব্বদাই সৎ সঙ্কল্পরূপ রত্নদ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। তাঁহার দ্বারা জগতের কোন অহিত কার্য্য সংঘটিত হওয়া সম্ভবপর নহে।

শিশু, বালক, যুবক তোমরা যদি স্বকীয় জীবনকে উন্নত করিতে চাও, যদি দেশের সমাজের, স্বজাতির হিতসাধন করিতে চাও, যদি জগতে কোন মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া কীর্ত্তিস্থাপন করিতে চাও, যদি তোমার আত্মাকে পবিত্র করিতে ইচ্ছা কর, যদি মানব জীবনকে সার্থক করিতে ইচ্ছা কর, তবে এই সময় তোমার হৃদয়-ক্ষেত্রে সুশিক্ষার বীজ বপন কর। এইসময় তোমার হৃদয় কর্ষিত ক্ষেত্রের ন্যায় কোমল আছে। কর্ষিত ক্ষেত্রে অচিরেই অঙ্কুর উদ্গত হইতে দেখা যায়, যদি এই সময় হৃদয়ে সুশিক্ষার বীজ বপন কর, তাহা হইতে কালে অমৃতময় ফল লাভ করিতে সমর্থ

হইবে। আর যদি কুশিক্ষার বীজ বপন কর, তবে বিষ বৃক্ষ জন্মিবে এবং তাহা হইতে বিষময় ফল ভোগ করিবে।

এক্ষণে তোমাদের হৃদয় কোমল কর্দ্দম সদৃশ আছে। কোমল কর্দ্দমকে যেমন যে ভাবে ইচ্ছা গঠিত করিতে পারা যায়, তেমনি তোমাদের হৃদয়কে যে ভাবে ইচ্ছা গঠিত করিতে পার। যদি সুভাবে গঠিত কর অর্থাৎ যদি সুশিক্ষা লাভ কর, তবে তদ্দ্বারা সমাজের, স্বদেশের, স্বজাতির ও জগতের উপকার বৈ অপকার হওয়ার আশঙ্কা নাই। আর যদি কুভাবে গঠিত কর অর্থাৎ কুশিক্ষা লাভ কর, তবে তদ্দ্বারা অপকার বৈ কোনও উপকারের আশা করিতে পারা যায় না। তাই বলি, ভ্রাতৃগণ, সতর্ক হও। তোমাদের হৃদয়ে সুশিক্ষার বীজ বপন করিবার, তোমাদের হৃদয়কে উন্নত করিবার, তোমাদের হৃদয়কে সুভাবে গঠিত করিবার এই উপযুক্ত সময়। এই সময়ে হৃদয় খানিকে মনমত ভাবে গড়াইয়া লও, তবে আজীবন এমন কি জীবনান্তেও তাহার ফল ভোগ করিতে সমর্থ হইবে।

ভ্রাতৃগণ, এই যে তোমাদের চক্ষের সম্মুখে ইংরেজ জাতি উন্নতি শিখরের কত উচ্চে উপবেশন করিল! ইহা কি শুধুই শিক্ষার প্রভাবে নহে? যে ভারত ভূমিতে তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং যে ভারত ভূমিতে তুমি এইক্ষণ বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছ, ইহাও একদিন উন্নত ছিল। যেখানে প্রথমে আর্য্যজাতির আবির্ভাব হইয়াছিল, সেই দেশের অধিবাসিগণ এক্ষণে শিক্ষার অভাবে অসভ্য জাতি মধ্যে পরিগণিত, ইহা কি শুধু শিক্ষার অভাব হেতু নহে? যদি ভারতবাসীর হৃদয় হইতে শিক্ষারূপ অমূল্য বস্তু তিরোহিত না হইত, তাহা হইলে কি তাহারা এত দীন হীন হইয়া পড়িত? যে দিন হইতে ভারতবাসীর হৃদয় মন্দির হইতে শিক্ষার আলো তিরোহিত হইয়াছে, সেই দিন হইতেই তাহাদের হৃদয় অজ্ঞানন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে।

তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণও একদিন ঐরূপ শিক্ষিত ছিলেন এবং সেই শিক্ষার গুণেই ভারত-ভূমির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। যতই তোমাদের মধ্য হইতে শিক্ষার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে, ততই তোমরা অবনতির গভীরতম কূপে নিমজ্জিত হইবে।

তাই বলি ভ্রাতৃগণ, এখনও সাবধান হও! হৃদয়-ক্ষেত্রে সুশিক্ষার বীজ বপন কর। হৃদয়-মন্দিরে সুশিক্ষার আলো প্রজ্জ্বলিত কর। হৃদয়কে উন্নত ও জীবনকে পবিত্র কর! তাহা হইলে সৌভাগ্য-রাজ্যে উপনীত হইতে পারিবে। অচিরেই তোমাদের সৌভাগ্য-সূর্য্য গগনমণ্ডলে দেখা দিবে। শীঘ্রই সৌভাগ্য-জোয়ারে তোমার তরণী ভাসিবে। জন্মভূমি ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিলে, ভারতমাতার সুসন্তান বলিয়া পরিচিত হইতে পারিবে। তাহা হইলেই তোমার মানবজন্ম সার্থক হইবে।



আধুনিক শিক্ষা।

ষষ্ঠ প্রস্তাব।

আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধর, ভাবী আশাস্থল ছাত্রসমাজ প্রথমতঃ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার কালে শিক্ষার সহিত একটি মহতী উচ্চ আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া সেই পঠদ্দশায় দেশের এবং দশের মনোরঞ্জন করিতে থাকে। তৎপর ক্রমশঃ প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে অগ্রবর্ত্তী হইতে হইতে তাহাদের হৃদয়ের কোমলতা, সরলতা, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি প্রবৃত্তি নিচয় ক্রমেই লোপ পাইয়া যায়। বর্ত্তমান শিক্ষায় ইহা কতদুর ঘটিয়াছে, তাহা চিন্তাশীল বিচক্ষণ সুধীবর্গের বিবেচনাধীন।

এই শিক্ষা উপলক্ষে তাহারা তোতাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য সাধন করে। অতঃপর ছাত্র নাম এড়াইয়া তাহাদের সেই অদম্য উৎসাহ, অসীম সৎসাহস, উচ্চ আশা এবং স্বর্গাদপি জন্মভূমি ও জীবনোদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া বিদ্যাভিমান প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া আত্মোন্নতি এবং মনুষ্য জীবনের কর্ত্তব্য পালনাদির বিশেষ চেষ্টা পরিত্যাগ করে। তখন অনুকরণ-প্রিয়তা তাহাদের হৃদয় মন অধিকার করিয়া বসে। পাশ্চাত্যালোকে বিমুগ্ধ হইয়া ইহারা উহার গুণভাগ পরিবর্জ্জন করিয়া দূষণীয় ভাগ আত্মসাৎ করে। এই শ্রেণীর ছাত্রগণের অবস্থাক্রমে সকলের ভাগ্যে উচ্চ শিক্ষা ঘটিয়া উঠে না। বরং পারিবারিক অসুবিধা ও অশান্তিতে কুটিল সংসার-নরকে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য হইয়া অর্থোপার্জ্জনের জন্য লালায়িত হয়, এবং চাকরীর চেষ্টায় পাঠ শেষ করে। কেহ বা জয় থাকিতে রণে ভঙ্গ দিয়া বসে। অর্থোপার্জ্জন এবং বিদ্যোপার্জ্জন স্বতন্ত্র বিষয়। কেননা, যাঁহারা সরস্বতীর সেবক, তাঁহাদের প্রতি ভাগ্যলক্ষ্মী সৎ মা। আর যাঁহারা ভাগ্যলক্ষ্মীর বরপুত্র,

তাঁহাদের প্রতি সরস্বতী প্রতিকূল। এরূপ স্থলে যাহারা অর্থের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, ভালমন্দ বিবেচনা বিচার না করিয়া, চাকরী অথবা যে কোনও প্রকারে অর্থ পিশাচের ন্যায় অর্থ সংগ্রহ করিতে ব্যস্তসমস্ত হইয়া পড়ে, তাহাদের মনে তখন পরোপকার, বিনয়, সৌজন্য, নম্রতা, ধৈর্য্য, দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদ্বৃত্তিগুলি স্থান না পাইয়া চিরদিনের জন্য অবসর গ্রহণ করে। পরন্তু কিসে রাজ-দ্বারে সম্মানিত হইবে, কিসে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর মনস্তুষ্টি করিবে,—কিরূপে পাশ্চাত্য সমাজে যোগদান করিতে পারিবে,—কি করিয়া যশস্বী এবং সংবাদ-পত্রাদি দ্বারা উচ্চনিনাদে প্রশংসিত হইবে—এই চিন্তাই তাহাদের মনে মুখে জাগরূক থাকিয়া তাহাদিগকে অস্থির করিয়া তুলে। অথচ সেই উদ্দেশ্য সাধনার্থে আজীবন পরিশ্রম এবং লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াও ক্ষণেকের জন্য সুখী হইতে পারে না—এরূপ উদাহরণও বিরল নহে।

পরোক্ষে উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে কোনও কোন পুরুষসিংহ ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপালাভ করেন বটে, কিন্তু কাল পাত্র ভেদে তাঁহাদের পরোপকারব্রত, স্বজাতি-প্রেম, স্বদেশ হিতকর অনুষ্ঠানাদির প্রতি ততোধিক দৃষ্টি থাকেনা।

মধ্যম শ্রেণীর সেবকদের কথা আর কি বলিব! আধুনিক সুকবি ও সুলেখকদিগের অবস্থা মনে করিলে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। গ্রন্থকারদের সম্বন্ধে লেখাই বাহুল্য। এইজন্যই আমাদের দেশের এত দুর্দ্দশা ও শোচনীয় অধঃপতন। এই সমুদায় কারণ পরম্পরায় আমরা নানা জাতি কর্ত্তৃক লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া থাকি।

উচ্চ শিক্ষিতগণের মধ্যে অল্প সংখ্যক লোকই রাজকর্ম্মচারী হইয়া থাকেন। রাজকীয় উচ্চ কর্ম্মগুলি এই দেশীয় ব্যক্তিবর্গের প্রাপ্য, কিন্তু এ পর্য্যন্ত সদাশয় গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে অমনোযোগিতা প্রদর্শন করিতেছেন। সৈনিক বিভাগ ও নৌ-বিভাগ আমাদের পক্ষে চিররুদ্ধ। সুতরাং

রাজকীয় পদ আমাদের নিকট অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ বা অলীক স্বপ্নমাত্র। যদিও রাজকীয় সমুদায় কর্ম্ম শিক্ষিত বাঙ্গালী কর্তৃক অধিকৃত হয়, তথাপি তাহাতেও তেত্রিশকোটী হিন্দু মুসলমানের জীবনোপায় নির্দ্ধারিত হওয়া সম্ভবপর কি? কতিপয় ব্যক্তি চাকরীর আশা ভরসা করিতে পারে বটে, কিন্তু আর অবশিষ্ট লোকের স্থান হইবে কোথায়? উকিলী, মোক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারী, শিক্ষকতা, এবং চিকিৎসা ও সওদাগরী আফিস সমূহে অন্যান্য অবলম্বন আছে মানিলাম, কিন্তু অগণিত জন সংখ্যাকে উহারা চিরকাল প্রতিপালন করিতে পারে না।

এখন সকল দিকের সকল পথই অতিশয় দুর্গম এবং সঙ্কীর্ণতর হইয়া উঠিয়াছে। এই জন্য বঙ্গের উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের জীবন মৃত্যুতুল্য সমস্যায় পরিণত হইয়াছে—দেশ মধ্যে একটা বিকট হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। গবর্ণমেণ্টেরও দীর্ঘ শৈথিল্যের অবসান হইয়াছে,—তীব্র দৃষ্টি পড়িয়াছে। উচ্চ শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া এই গণ্ডগোল সমস্যার প্রকৃত মীমাংসা দ্বারা তাহার প্রতীকার করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। নিম্নপ্রাথমিক হইতে অত্যুচ্চ ইংরেজী শিক্ষার পথ বিষময় কঠিন করিয়াছেন। এই শিক্ষা ধনবানের অথবা উচ্চবর্ণের সন্তানাদির পক্ষে সমীচীন করিয়া এইরূপ অভিনব শিক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বোধ হয় ক্রমশঃ আরও কঠিন হইবে।

কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ কালে বড়লাট লর্ড কার্জ্জন এই মর্ম্মে বলিয়াছিলেন,—"তোমাদের উচ্চ শিক্ষা লাভ করিবার যত্ন দেখিতেছি বটে, কিন্তু এস্থলে দেখিতেছি তোমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য বিবাহকালীন কন্যাপক্ষ হইতে অধিক পরিমাণে যৌতুক গ্রহণ জন্য বিদ্যাশিক্ষা করা। আরও হয়ত তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ আইন ব্যবসায়ী অথবা ব্যবহার জীবি হইয়া তোমাদের ছাত্রগণের আইন শিক্ষকতায়

কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া 'সিডিসন ডিফামেসন' গুলি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবে। হয়ত তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ সংবাদ পত্রের সম্পাদক হইয়া গবর্ণমেণ্টের ছিদ্রান্বেষণ করিবে—ঘোরতররূপে রাজনীতি আলোচনা করিবে। কিন্তু আমি আদৌ ইহার পক্ষপাতী নহি। ব্যবসায়ে মন দাও, শিল্প শিক্ষা কর, কৃষিকার্য্যে রত হও।"

বোধ হয় সেই ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি শিক্ষা কমিশন বসাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং ইহাও তাঁহার মনোগত ভাব ছিল যে, বঙ্গবাসিগণ স্ব স্ব বর্ণ বিভাগ মতে যে বর্ণের লোকের যে ব্যবসায়, সে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করুক। বাস্তবিক পক্ষে তবে আর কুম্ভকারের পুত্র এবং জোলার পুত্র বিচারাসনে বসিত না ;—রজকের পুত্র এবং তেলীর পুত্র কখন উচ্চ-রাজ-কার্য্যে নিযুক্ত হইত না ; মদ্য ব্যবসায়ীর পুত্র কখন জেলার কর্ত্তা হইতে পারিত না ; দুই গণ্ডা কাণা কড়ি ভিখারীর ছেলে ফাটকে পাঠাইবার শক্তি পাইতনা।

পূর্ব্বে স্বর্ণকার ও তন্তুবায় প্রভৃতি নব-শাখার দল দু'চার পাতা ইংলিশ পড়িয়া কাণে কলম গুঁজিয়া সওদাগরী আফিস ও রেলওয়ে আফিস এবং পুলিশ ও ডাক বিভাগের আফিসাদিতে গিয়া চাকরীর উমেদারী করিত না।

সেকালে বর্ণ বিভাগানুসারে কর্ম্ম-বিভাগ প্রণালী সমাজ মধ্যে প্রবর্ত্তিত থাকায় একরূপ সুখ সচ্ছন্দতা ছিল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। বর্ত্তমান সময় সেই প্রথার বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে ;—তৎপরিবর্ত্তে বৈদেশিক ভাব সমাজ মধ্যে বদ্ধপরিকর হইয়া এরূপ যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে এবং উচ্চ নীচ সমানে রাজ-দ্বারে ঠেলা ঠেলি করিতেছে। সুতরাং সকল শ্রেণীর লোকেরই জীবনোপায় সম্বন্ধে এইরূপ বিপ্লব ঘটিয়াছে। ইহার উপর কতকগুলি আনুসঙ্গিক উপসর্গে দেশ উৎসন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে।

তজ্জন্য লর্ড কার্জ্জন সংস্কারের বিশেষ আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া এই অধঃপতনোন্মুখ জাতির উদ্ধার মানসে স্থির সংকল্প করিয়াছিলেন।

এই দেশের অশিক্ষিত লোকের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। বোধ হয়, অশিক্ষিতের সংখ্যা শিক্ষিত হইতে দশগুণ অধিক বেশী। যাহারা কিঞ্চিৎ পরিমাণে লেখা পড়া শিখিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছে, সেই শ্রেণীর জীবনোপায়ের পন্থা কি? শিক্ষিতগণের যাহা হউক একটা না একটা অবলম্বন আছে, কিন্তু অর্দ্ধ শিক্ষিত দলের অবলম্বন কি? কি শ্রম-সাধ্য-কার্য্য, কি ব্যবসায় বুদ্ধি, কি কারবারের মূলধন, কি বিদেশযাত্রা প্রভৃতির অর্থ সামর্থ্য কিছুই নাই; সুতরাং তাহারা কিম্ভূত কিমাকার হইয়াছে বলিতে হইবে। ইহাদের অদৃষ্টবলে যদি রেলওয়ে কর্ম্ম, কেরাণীগিরী—যে কোনও একটা চাকরী যোগাড় হইয়া উঠে, তবে অনেক হইল মনে করে। সেই ১০৲ বা ১৫৲ টাকার উপর একটি সংসার নির্ভর করে। কিরূপে তাহাদের পরিবার প্রতিপালন, লৌকিকতা এবং সম্মান রক্ষা ও সন্তান সন্ততির বিদ্যা শিক্ষা প্রভৃতি ব্যয়াদি নির্ব্বাহ হয়, ভাবিলে মাথা ঘুরিয়া পড়ে। ইহার পরিণাম ফলে মনুষ্যোচিত দয়া ধর্ম্ম, বল, বিক্রম এবং স্বাধীনতা সদ্‌গুণগুলি তাহাদের নিকট হইতে চিরকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করে। সুতরাং তাহারা বিকলাঙ্গ হইয়া অনন্য মনে দাসত্বের শৃঙ্খলভার বহন করিয়া জীব-রাজ্যে বিচরণ করিতে বাধ্য হয়।

মুসলমানগণের শিক্ষার বিবরণ।

সপ্তম প্রস্তাব।

যাঁহারা বাঙ্গালার মুসলমানদের অবস্থা অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন যে, বঙ্গীয় মুসলমানগণ শুধু ধর্ম্মবিশ্বাসের বশীভূত হইয়াই গবর্ণমেণ্টের বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতেছিল না এবং এই সমস্ত বিদ্যালয়কে তাহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ মনে করিত। ইহার যে বিষময় ফল হইয়াছে, তাহা আজ জগতের সাক্ষাতে বিদ্যমান। যে প্রদেশে মুসলমানগণ বাস করেন, সেই প্রদেশেই একই গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে একই বিধি ব্যবস্থার অধীন হিন্দু ভ্রাতৃগণও বাস করেন। কিন্তু সেই কারণটা কি যে জন্য একজাতি শিক্ষায়, নব বিজ্ঞানের আলোচনায়, গবর্ণমেণ্ট এবং জনসাধারণের উপর প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছে এবং জাতীয় একতা ও উন্নতিতে ভারতীয় সমগ্র জাতি হইতে উন্নত হইয়াছে, আর সেই প্রদেশেরই অধিবাসী অন্য এক জাতি, শুধু যে অন্যান্য জাতি হইতে পশ্চাতে আছে এমন নহে, বরং স্বধর্ম্মাবলম্বী অন্যান্য প্রদেশের মুসলমান অপেক্ষাও অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ববঙ্গের শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর এই বিষয় বিশেষ চিন্তা করিয়া তাঁহার বার্ষিক রিপোর্টে মুসলমানদের শিক্ষাবনতির কারণ উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার রিপোর্টের ৯৯ পৃষ্ঠায় যে সমস্ত কারণ উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিলাম। তিনি লিখিয়াছেন,—"যখন আমি মুসলমানদের শিক্ষার সম্বন্ধে চিন্তা করি, দেখি যে তাহাদের শিক্ষা তিন ভাগে বিভক্ত। যথা ঃ—ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়। যখন মুসলমানদের হাত হইতে শাসন রজ্জু স্খলিত হইয়াছিল, যখন পার্সী

আর বিচারালয়ের ভাষা ছিল না, তখন মুসলমানগণ যাহারা বাঙ্গালীদের ন্যায় চতুর ছিল না আপনাদের অতীত সময়ের স্মরণে এবং পুরাতন ভাষার ধ্যানে নিমগ্ন রহিল। তদ্ব্যতীত তাহাদের সমাজিক প্রথা—যেমন পর্দ্দা প্রথা, এবং তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস, তাহাদিগকে এযুগের জীবন সংগ্রামের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত করিয়া দিল। স্কুলের পাঠ্যাভ্যাসের পূর্ব্বে তাহাদিগকে মসজেদে পড়া আবশ্যক। যে বয়সে হিন্দু বালকগণ স্কুলে প্রবেশ করে তাহার অনেক বিলম্বে মুসলমান বালক স্কুলে যোগদান করে, কেননা স্কুলের শিক্ষা আরম্ভ করিবার বহু পূর্ব্বে বহু বৎসর তাহার ধর্ম্মবিদ্যা শিক্ষা করিয়া মুক্ত হইতেই অতিবাহিত হয়। যে সময় একজন হিন্দু ছাত্র ইংরেজী এবং গণিত শিক্ষার্থে কোন একটি সরকারী বিদ্যালয়ে ব্যয় করে, একজন মুসলমান ছাত্র সেই সময় আরবী ফেকা এবং হাদিস শিক্ষার্থ কোন মাদ্রাসায় ক্ষেপন করে।”

অতঃপর ডিরেক্টার সাহেব বাঙ্গালার মুসলমানদের শিক্ষা এবং তত্রত্য মাদ্রাসা সমূহের বিবরণপূর্ণ অতি বিস্তৃত এবং যুক্তিপূর্ণ পুস্তিকা হইতে এই সংক্ষিপ্ত তত্ত্ব উদ্ধৃত করিতেছেন।

“মহোদয়গণ! আমার নিকট বাঙ্গালার মুসলমানদের শিক্ষার প্রশ্ন বিশেষ জটিল ও সমস্যাসঙ্কুল, আমি এ বিষয়ে চট্টগ্রাম মাদ্রাসার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মৌলভী কামাল উদ্দিন এম, এ, সাহেবের পুস্তিকা দ্বারা অনেক জানিতে সক্ষম হইয়াছি। এই সমস্ত মাদ্রাসার শিক্ষা প্রণালীতে যে ফল হয়, তৎসম্বন্ধে আমি মৌলভী সাহেবের রায় সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছি। তিনি লিখিতেছেন,—“শিক্ষাবস্থায় শিক্ষার্থীগণ চিন্তা করে না যে শিক্ষা শেষে তাহাদিগকে কি করিতে হইবে। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, শিক্ষা শেষে এই ছাত্রদের জীবন অতি কষ্টে অতিবাহিত হয়। তাহাদের মধ্যে অনেকে প্রায় অনশনে দিন যাপন করে; কতকগুলি

মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর কাজী হন, কতকগুলি স্কুলে পার্সীর শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং অল্প কয়েকজন ব্যবসা আরম্ভ করেন। কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনেকেই হয় গ্রামের ভিতর মিয়াজী সাজিয়া মোক্তব খোলেন কিম্বা গ্রামে গ্রামে ওয়াজ করিয়া বেড়ান। কিন্তু তাঁহাদের কৃতকার্য্যতা তাঁহাদের বিদ্যা বুদ্ধির উপর নির্ভর করে না, যিনি যত চিত্তাকর্ষক ও উচ্চকণ্ঠে বক্তৃতা দিতে পারেন, তিনি যাহাই বলুন না কেন অতি সত্বর কৃতকার্য্য হইতে পারেন। যদি কোন মৌলভী আপনাকে অন্য মৌলভী অপেক্ষা বিদ্বান বলিয়া প্রকাশ করে, তবে সেই দুই মৌলভীর মধ্যে তর্ক করান হয় এবং উহাদের মধ্যে যে খুব উচ্চ স্বরে বলিতে পারে, সকলকে হাসাইতে পারে, শ্রোতৃগণকে সন্তুষ্ট করিতে পারে, সেই জয়লাভ করিতে সক্ষম হয়। যে মৌলভী কাজীর পেশা করেন তাঁহার প্রচুর আয় হয়,কিন্তু অন্যান্য মৌলভীদের আয় অত্যন্ত কম। যখন তাঁহাদের কোন চাকরী হইয়া উঠে না, তখন তাঁহারা গ্রামে যাইয়া ওয়ায়েজের কার্য্য আরম্ভ করেন এবং এই প্রকার মৌলভীর এত আধিক্য হইয়াছে যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিবন্ধন আসর জমাইবার জন্য তাঁহারা ঘৃণার্হ পদ্ধতি অবলম্বন করিতেও দ্বিধা বোধ করেন না।"

ভদ্রমণ্ডলী! উল্লিখিত মতগুলি এমন এক ব্যক্তির যিনি স্বয়ং শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মচারী, উচ্চ শিক্ষায় অলঙ্কৃত এবং মুসলমান। এখন চিন্তা করুন এই উন্নতিযুগে, যৎকালে সমগ্র জগৎ এমন কি বঙ্গদেশই উন্নতির দিকে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছে, আর আমাদের বাঙ্গালার মুসলমান এত দুঃখে কষ্টে অভিভূত। এখন উক্ত প্রদেশের শিক্ষা বিভাগের ইন্‌স্পেক্টার মৌলভী আব্দুল করিম সাহেবের মত আপনাদের সম্মুখে নিবেদন করিতেছি। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি তথাকার মুসলমানদের শিক্ষা সম্বন্ধে এক পুস্তক লেখেন। তাহাতে তিনি মাদ্রাসার ও মোক্তবের

শিক্ষা সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।—"মুসলমানদের কর্ম্মজীবিগণ মোক্তবে তাহাদের শিক্ষা কার্য্য সম্পাদন করে। তাহাদের সাধারণ শিক্ষাকার্য্য এবং সাংসারিক অবস্থা তাহাদের স্বদেশবাসী হিন্দু ভ্রাতৃগণ অপেক্ষা অতি নিম্নস্তরের এবং ইহার একমাত্র কারণ তাহারা তাহাদের পাঠশালায় যে শিক্ষা পায় সেই শিক্ষা। একজন হিন্দু চার পাঁচ বৎসরে পাঠশালার শিক্ষা সমাপন করিয়া হয় দোকানদার মহাজন বা জমিদারের সেরেস্তায় মোহরী নতুবা গোমস্তা নিযুক্ত হয়, ইহার বিপরীত মোক্তবের শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্র ইহার একটি কার্য্যেরও উপযুক্ত হয় না, যদিও তাহার দ্বিগুণ সময় মোক্তবে ব্যয়িত হয়। মোক্তবের শিক্ষা তাহাদিগকে এক অতি অদ্ভুত ভয়াবহ প্রাণীতে পরিণত করে, এবং এ সমস্তের ফল এই হয় যে এই সকল চাকরী অতি নিম্নস্তরের হিন্দুদের আয়ত্তাধীন হইয়া পড়িয়াছে। যদি সময়ের তাড়নায় মোক্তবের শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি স্বীয় পৈতৃক ব্যবসায় অবলম্বন করিতে বাধ্য না হয়, তবে সে কোন গ্রামে গিয়া মোল্লা হইয়া বসে; তাবিজ লেখে আর জিন, ভূত তাড়ায়, স্বীয় দুর্ব্বল বিশ্বাসী প্রতিবেশীদিগকে মুরিদ (শিষ্য) বানাইতে আরম্ভ করে এবং ধর্ম্মের আবরণে আবৃত করিয়া শঠতা প্রবঞ্চণা দ্বারা লোকদিগকে প্রতারিত করিয়া নিজের রুটী সংগ্রহ করে। এমন কি মুসলমানদের মোক্তবের অসম্পূর্ণ শিক্ষাই উচ্চশিক্ষার প্রথম স্তর। মোক্তবের পাঠ্য পুস্তক একটি মুসলমান ছেলের পক্ষে বিশেষ প্রতিবন্ধক এবং সে উহা হইতে বহু দূরে পলায়ন করে। পক্ষান্তরে পাঠশালার পাঠ্য পুস্তক হিন্দু বালকের হৃদয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য এক তীব্র বাসনার সৃষ্টি করে এবং সেই বাসনা শ্রোত তাহাকে উচ্চ শিক্ষার দিকে ধাবিত করে। যাহা হউক, মুসলমানদের মঙ্গলের জন্য মোক্তবের অবস্থার প্রতি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি করা অতি প্রয়োজন।

প্রাথমিক মাদ্রাসা সমূহের নিম্ন শ্রেণীতে সাধারণ ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ পড়ান হইয়া, সেই সমস্ত গ্রন্থ মোক্তবাদির উচ্চ শ্রেণীতে পড়ান হয়। যে সমস্ত গ্রন্থ অন্যান্য আরও উচ্চ শ্রেণীর মাদ্রাসার প্রাথমিক শ্রেণীতে পড়ান হয়, যেমন সাহিত্য, আরবী ব্যাকরণ, ন্যায়শাস্ত্র, মোহাম্মদীয় ধর্ম্মবিধি, ধর্ম্ম বিষয়ক গ্রন্থ, অঙ্কশাস্ত্র, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান এবং এইরূপ অন্যান্য পুস্তক মাদ্রাসার পাঠ্য তালিকায় স্থানই পায় না। গবর্ণমেণ্ট কিম্বা সাহায্য প্রাপ্ত মাদ্রাসা সমূহে যে সমস্ত নামমাত্র অঙ্কশাস্ত্র পড়ান হয় তাহাও অসাহায্যকৃত মাদ্রাসায় পড়ান হয় না। কোন কোন মাদ্রাসায় পড়াইবার নিয়ম মোক্তবের নিয়মের ন্যায় অনুন্নত, কাজেই মাদ্রাসার শিক্ষাপ্রাপ্ত কোন ছাত্র সমশ্রেণীর লোকদের মধ্যে কোন ক্রমেই কোন মোক্তবের শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্র অপেক্ষা উন্নত হইতে পারে না। উচ্চ মাদ্রাসা সমূহে নিম্ন মাদ্রাসার পাঠ্য ব্যতীত ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রথম খণ্ড, মুসলমানীয় আইন এবং উত্তরাধিকারীত্ব বিষয়ক আইন, যাহা প্রথমে শুধু চাকরীর জন্য পড়ান হইত মুসলমান ধর্ম্মবিধির জ্ঞানার্জ্জন, এবং একখানা বিজ্ঞানের পুস্তিকা, সিরিয়া বিজয়ের একখানা সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও পাঠ্য তালিকাভুক্ত আছে। কিন্তু ইহাও ইতিহাসের ন্যায় পড়ান হয় না বরং তর্কশাস্ত্রের ন্যায় পড়ান হয়। ইহা ব্যতীত তাহাদিগকে আরবী হইতে পার্সীতে এবং পার্সী হইতে আরবীতে অনুবাদ শিক্ষাও দেওয়া হয়; কিন্তু ছাত্রদিগকে কি কখনও অনুবাদের নিয়ম পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয়? কোন বিদেশী ভাষাকে মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়াই হইতেছে রীতি, কিন্তু মাদ্রাসার ছাত্রদিগকে উর্দ্দুর সাহায্যে পার্সী শিক্ষা দেওয়া হয় এবং সেই উর্দ্দু সে নামমাত্র জানে। এইরূপ আরবী, উর্দ্দু এবং পার্সীর সাহায্যে শিক্ষা লাভের চেষ্টায় সে অনর্থক সময় এবং মস্তিষ্কের অপব্যবহার করে। একটি পরদেশী

ভাষাকে অন্য একটি বিদেশী ভাষার সাহায্যে শিক্ষা করিলে সে শিক্ষা অসম্পূর্ণ ও বিকলাঙ্গ হইবে না কেন? ইহার ফল এই হয় যে, মাদ্রাসার কোন ছাত্র নিজের মনোভাব আরবী অথবা পার্সীতে সম্পূর্ণ ব্যক্ত করিতে পারে না। উর্দ্দু সম্বন্ধে বঙ্গে মৌলভী খুব কমই আছেন যিনি অব্যয় এবং বিশেষণাদির নির্ভুল প্রয়োগ করিয়া কথা কহিতে পারেন। তাহারা এমন অনেক জিনিষের নামও জানে না, যাহা জীবন ধারণের জন্য প্রতিদিন আবশ্যক হয়। বাজারি হিসাব ও জমিদারী খাতা অল্পবিস্তর জানিতে সক্ষম হইতে পারে, কিন্তু সে এতটুকু জানে না যে, কবুলিয়ত, পাট্টা কিরূপে লিখিতে হয়; যদিও একটি প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র অতি পরিপাটী রূপে এ সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারে। ভূগোলে সে এতদূর অনভিজ্ঞ যে, সে এটাও জানে না জেলার সহিত প্রদেশের এবং প্রদেশের সঙ্গে সাম্রাজ্যের কি সম্বন্ধ। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কি ফল তাহাও সে জানে না' সাধারণ অভিজ্ঞতায় সে একটি প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র অপেক্ষা অতি হীন। এমন কি তাহার আরবী পার্সীর জ্ঞানও এত উন্নত নহে যে, একজন পারদর্শি শিক্ষক হইতে পারে, কারণ উক্ত বিদ্যা শিক্ষার যে উপায় তাহারা অবলম্বন করিয়াছে তাহার মূলেই গলৎ।"

কেহ কেহ বলিতে পারেন এই উদ্দেশ্যে এ সমস্ত মাদ্রাসা স্থাপিত করা গিয়াছে যে, ইহাতে ধর্ম্মবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া যায় এবং ইহার ছাত্রগণ মৌলভী ও প্রচারক হয়। একথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। আচ্ছা এই উদ্দেশ্যই ধরিয়া লইয়া দেখা যাউক যে, সে উদ্দেশ্য কতদূর সফল হইয়াছে। এই সমস্ত মাদ্রাসার ছাত্রগণ কি জানে ইস্‌লামের ইতিহাস কি? রসুলে খোদার ঐতিহাসিক জীবনী কি জিনিষ? তাহারা কি মুসলমানদের ধর্ম্মবিধিই সম্যক পরিজ্ঞাত? তফসির এবং হাদিসেই কি তাহাদের সম্পূর্ণ দক্ষতা আছে? আমার ভয় হইতেছে "না" দ্বারা এই প্রশ্নের

উত্তর দিতে হইবে। এই সমস্ত মাদ্রাসার শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণ উপরোল্লিখিত কারণ বশতঃ পাঠ্য পুস্তকে তাহাদের সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা না থাকার জন্য, তাহারা ইস্‌লামের সাধারণ আরকান (ধর্ম্ম বিশ্বাস) সম্বন্ধে কোনরূপে বক্তৃতাদি দিতে পারে; কিন্তু সাংসারিক বিষয়েত বক্তৃতা দেওয়া তাহাদের পক্ষে এক অসম্ভব ব্যাপার। ইহা ব্যতীত তাহারা স্ব স্ব দেশের ভাষায় এত অনভিজ্ঞ যে, শ্রোতৃমণ্ডলীকে তাহাদের মনোভাব বাঙ্গালায় বুঝাইতে সক্ষম হয় না। তাঁহারা উর্দ্দুতে বক্তৃতা করেন এবং একজন অনুবাদক তাহা বুঝাইয়া থাকেন। ইহা হইতে হাস্যাস্পদ আর কি আছে? সমাজের ভিতর প্রথম হইতেই এই অনুপযুক্ত মোল্লা—যাহারা কোন প্রকারেই ইস্‌লাম গুরু বা ইস্‌লামের বক্তা বলিয়া কথিত হইবার উপযুক্ততা এবং দক্ষতা রাখে না, এত অধিক যে সমাজ তাহাদের জন্যই অধঃপাতে যাইতেছে। সমাজের অশিক্ষিত জনসাধারণ, যাহারা সমাজের এক বড় অংশ, মজহাবী শিক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এবং তাহাদিগকে সাংসারিক শিক্ষাও প্রদান করা হয় না। সামাজিক দুর্ব্বলতা, যাহা নিম্নস্তরের মুসলমানদের ভিতর দৃষ্টিগোচর হয়, বহু সংখ্যক উচ্চশিক্ষিত লোকের অভাবের ফল এবং উহার উন্নতি অসম্ভব যে পর্য্যন্ত মাদ্রাসা এবং মোক্তবে শিক্ষার মূলে গলৎ বর্ত্তমান থাকিয়া যাইবে।"

চাকরী ও ব্যবসায়।

অষ্টম প্রস্তাব।

বাঙ্গালীজাতি সতত 'চাকরী' 'চাকরী' করিয়াই পাগল বা বিকার-গ্রস্ত। বর্ত্তমান সময় চাকরী আমাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম এবং ইহ-পরকালের নিস্তার ও সুখে পরিণত হইয়াছে। চাকরী শরীরের সঞ্জীবনী শক্তি ও হৃদয়ের বল-শান্তি—জীবনের একমাত্র সম্বল। চাকরী জুটিতে কিছুকাল বিলম্ব ঘটিলে দু'নয়নে অন্ধকার দেখি,—দিবা রাত্রি চাকরীর চিন্তায় মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটাই। কিন্তু ইহা কেহই তলাইয়া দেখিতেছি না যে, এত লোকের জন্য চাকরী কোথায়? দেশশুদ্ধ যদি আমরা সকলেই গোলাম হইতে পাগল হই, তবে গোলাম রাখিবে কে? তাই বুঝি কলিযুগে চাকরীর বাজার নিতান্ত মন্দা হইয়া ভিন্ন মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়াছে!

আজকাল গ্রাজুয়েটদলও ২০৲—২৫৲ টাকার সামান্য চাকরী পাইলেই আহ্লাদিত ও কৃতার্থ হন, নিজকে ধন্য জ্ঞান করেন। কিন্তু গ্রাজুয়েট হইতে যে কত ব্যয়, কত শ্রম, কত নিশি জাগরণ—আরও কত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিতে হইয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখিতে গেলে দেখা যাইবে চাকরী কত কষ্টের বস্তু! এই কষ্টের বা সখের চাকরী করিতে আবার সময় সময় উপরের প্রভু যমদূতদিগের 'মুখঝাপটা' ও 'বক-বকানির' প্রবল তরঙ্গে কূলকিনারা না পাইয়া হাবুডুবু খাইতে হয়। কখন কখন যমদূতদিগের কোমল চরণের মোলায়েম আঘাত ও কোমল করের 'মুষ্টিযোগ' নীরবে সহ্য করিতে হয়। আবার সময় সময় প্লীহাও ফাটিয়া যায়। এইগুলি বুক পাতিয়া এবং পিঠ পাতিয়া লইয়া আনন্দে চাকরী করিতেছি—চাকরীর নামে খুন হইতেছি!

এমত অবস্থায় যদি আমাদিগকে কেহ আশ্বাস-প্রলুব্ধ বচন দেন, তবে দিবসে দশবার গিয়া তাহার বাসায় তোষামোদ করি। তিনি কিসে সন্তুষ্ট হইবেন, তাহাই করিতে অস্থির হই। বিবিধ উপঢৌকনে মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইলে, প্রস্তর-হৃদয়ে স্নেহ-বীজ অঙ্কুরিত হইলে, যোগ্যাযোগ্য বিবেচনা নাই, দয়া করিয়া উপহারের জোরেই একটা চাকরী প্রদান করিয়া অপ্যায়িত করিলেন।

যাহা হউক, এইরূপ কাণ্ডকারখানা করিয়াও যদি ছোটখাট গোলামী পাই, তবে এইখানেই প্রভু-তোষামোদের পর্ব্ব শেষ হইবে না। আরও আছে—আছে চাকরী বনাম গোলামী লইয়া সর্ব্বদা পদলেহন করিতেই হইবে। নতুবা চাকরী সূতিকা গৃহেই শ্লেষ্মা রোগে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে। হায়! তবুও বাঙ্গালীজাতির দাসত্ব রোগের লাঘব হইতেছে না!

এত গেল চাকরীর কথা। এখন একবার ব্যবসায় বাণিজ্যের বিষয় আলোচনা করা যাউক। এই ঘোর কলিযুগে, ঘোর দুর্দ্দিনে—ধোপা, নাপিত, তাঁতি, নাথ, জোলা, তেলী, কৃষক, শুঁড়ী, ব্রাহ্মণ, শেখ, কায়স্থ, মোগল সকলই যে লেখা পড়া শিখিয়া চাকরী করিতে দ্রুত পদে অগ্রসর হইতেছে, বস্তুতঃ তাহার ফল কি বিপরীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।—তাহাদের ব্যবসায় অবশিষ্ট লোক দ্বারা সম্পূর্ণ না চলায় ভিন্ন জাতীর প্রতিযোগিতায় ঐ সমস্ত ব্যবসায়ের মস্তকে কুঠারাঘাত পড়িয়াছে।

হেট কোট পেণ্টোলন পরিয়া আফিসে গিয়া চেয়ার হেলান দিয়া উপবেশন করাটা আমরা বাঙ্গালীর নিকট বড়ই গৌরবের বিষয় ও আরামের কথা। তাই আমরা 'মান সম্মান' করিয়া অর্থোপার্জ্জন হউক আর না হউক, সাধের চাকরীর জন্যই লালায়িত হইতেছি।

বর্ত্তমানে আমাদের ভ্রমমূলক ধারণা এই যে, লেখা পড়া শিখিলেই দাসত্ব করিতে হইবে, নতুবা বিদ্যা শিক্ষায় সভ্যতা কি? আমরা

যাহাদের দেখা দেখি সভ্য সাজিতে চাই, তাহাদের ইংলণ্ডে কিন্তু এরূপ প্রথা প্রচলিত নাই। তথাকার ব্যবসায়িগণ সমুদায়ই শিক্ষিত। সেখানের ব্যবসায়ী লোকের সম্মান আছে। আমাদের ভারতবর্ষীয় সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য অধিবাসিগণ যখন ব্যবসায়ীদিগকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিবেন, সেই দিন যদি শিক্ষিত মহাত্মগণ ব্যবসায় বাণিজ্যে মনোযোগ করেন।

অনেকে মনে করেন, এফ, এ,—বি, এ, পাশ করিয়াছি, আমি ব্যবসায় করিতে যাইব? এ বড়ই মারাত্মক লজ্জা ও অপমানের কথা! হায়! এজন্যই ব্যবসায়ের উন্নতি এবং দেশের মঙ্গল সাধিত হইতেছে না। পক্ষান্তরে এই ভারতবর্ষেরই অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসিগণ আমাদের হইতে এ বিষয়ে অনেকটা উন্নতি করিয়া সুখ-সোপানারোহণ করিয়াছেন ও করিতেছেন। মারওয়ারী প্রভৃতি সামান্য মাত্র সম্বল লইয়া শত শত ব্যক্তি লক্ষপতি ক্রোড়পতি হইয়া বসিয়াছেন।

কি নিয়মে ও কি নীতি অবলম্বনে ব্যবসায় বাণিজ্য করিতে হয়, তাহা তাহারা জানে, আমরা তাহা জানি কৈ? বুঝি কৈ? আমরা বিলাসিতার দাস, কলম চালনা ব্যতীত আর কোন কর্ম্ম করিতে হইলেই মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে। ব্যবসায় করিতে হইলে সময় সময় কষ্ট করিতে হয়। ওঃ! তাও কি আমাদের দ্বারা হয়? আমরা বাবু—ফুল বাবু! ধিক্ বাঙ্গালী তোমাদের জঘন্য বাবুগিরীতে!

পক্ষান্তরে ব্যবসায়িগণ বিমল আনন্দে দিবারাত্রি কাটাইতে পারেন। তাঁহাদিগকে তো আর পর-পদ মাথায় করিয়া মনস্তুষ্টির জন্য মাথার ঘামে চরণতল বিধৌত করিতে হয় না!

আমরা একবার যদি চারিদিকের জনসমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তবে দেখিতে পাইব যে, গণ্ড মূর্খ ব্যবসায়িগণও সামান্য মূলধনে ব্যবসায় করিয়া স্বাধীন ভাবে আমাদের বিদ্যাভিমানী গ্রাজুয়েট দলাপেক্ষা অধিক

সুখে দিনাতিবাহিত করিতেছেন। এক্ষেত্রে যদি শিক্ষিত মহাত্মগণ এ হেন সুখপূর্ণ লাভজনক ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করেন, তবে যে তাঁহারা স্বীয় বিদ্যা বুদ্ধির বলে অতি সহজে সুফল লাভে সক্ষম হইবেন, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। এ কথা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি।

সম্প্রতি আমাদের উৎসাহী হিন্দু ভ্রাতৃগণ এ বিষয়ে বেশ মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন। অনেকেই জাপান আমেরিকা যাইতেছেন। "শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষোন্নতি" সভাও স্থাপিত হইয়াছে। আশা করি, আমরা বুদ্ধিনাশা কর্ম্মনাশা অধঃপতিতদিগের প্রতিও এই সভার কৃপাদৃষ্টি নিপতিত হইবে।

এই সভার উদ্দেশ্যে বোধ হয় আমাদের চাকরীপ্রিয় বাঙ্গালীর দাসত্ব-রোগটার প্রাদুর্ভাব প্রশমিত হইবে। কিন্তু আমাদের নিদ্রাতুর মুসলমান ভ্রাতৃগণের এ দিকে একবার দৃষ্টি পতিত হইবে কি? হে মোহান্ধগণ, এখনও সময় আছে, এখনও রসাতলে যাও নাই। চক্ষু মেলিয়া দ্রুত গতিতে মাভৈঃ মাভৈঃ রবে ব্যবসায় বাণিজ্যে, শিল্পে, শিক্ষায় মন দাও।

স্বার্থ-পরতা।

নবম প্রস্তাব।

স্বার্থ-পরতা সমাজের একটি নালী ঘা বিশেষ। এই স্বার্থ-পরতায় প্রলুব্ধ হইয়া অনেক গণ্যমান্য শিক্ষিত ব্যক্তি সমাজকে সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখিয়া ন্যায়ের এবং সত্যের মস্তকে পদাঘাত করিতেছেন, ইহা নিরতিশয় ক্ষোভের বিষয়। সমাজে উচ্চাসন পাইবার জন্য, দেশে বিদেশে নাম ফাটাইয়া জয়ডঙ্কা বাজাইয়া মহাপুরুষ বা অবতার সাজিবার নিমিত্ত এবং গবর্ণমেণ্টের নিকট নিজকে বিশাল সমাজের নেতা বলিয়া পরিচয় দিয়া ধর্ম্ম পুত্র হইতে, বুক ফুলাইয়া চলিতে কেহ কেহ বড়ই পটু। কিন্তু ইহারা সমাজের কোনও হিত সাধন করিয়াছেন বলিয়া তো আমরা কাহাকেও জানি না। যদিও কেহ কোথাও কিছু করিয়া থাকেন, তবে তাহা নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের নিমিত্ত সমাজের জন্য নহে। এই জঘন্য স্বার্থপরতা যে মহা অনিষ্ট জনক এবং মানুষকে যে পশুত্বে পরিণত করে তাহা ধ্রুব সত্য।

স্বার্থ-পরতার অর্থ স্বাভীষ্ট পূরণেচ্ছা বা আত্মোদ্দেশ্য সাধনে ঐকান্তিকী ব্যগ্রতা। নিঃস্বার্থতা স্বার্থ-পরতার বিপরীতার্থের উদ্বোধক। মানব শরীরাভ্যন্তরে যত প্রকার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি আছে,স্বার্থ-পরতা তাহাদিগের মধ্যে অন্যতম। দেবতার সহিত পিশাচের এবং স্বর্গের সহিত নরকের যেরূপ সম্বন্ধ, স্বার্থ-হীনতার সহিত স্বার্থ-পরতার সম্বন্ধও অবিকল তদনুরূপ।

স্বার্থ-পরতা মানব হৃদয়কে নীরস মরুক্ষেত্রে পরিণত করিয়া ফেলে। বর্ষনোন্মুখ বারিদমণ্ডলী যেরূপ মরুময় দেশে উপনীত হইলে বারি বর্ষণ করা

দূরে থাক, প্রত্যুত তাহার ভীষণ সন্তাপে অদৃশ্য হইয়া যায়, সেইরূপ দয়া, মায়া, ভক্তি, প্রীতি, স্নেহ, মমতা, সরলতা, বাৎসল্যতা প্রভৃতি সদ্বৃত্তি সমূহ স্বার্থপরের অন্তরে থাকিয়া স্ব স্ব স্বাধীনশক্তি পরিচালন করিতেই পারেনা, পরন্তু তথায় ক্ষণমাত্র তিষ্ঠিতেও পারে না।

অন্যের সুখ স্বচ্ছন্দতা স্বার্থপরের চক্ষু-শূল! সে মনে করে, জগতে যাহা কিছু সুখের জিনিষ আছে, সমস্তই তাহার উপভোগের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে। জগৎ অনশনে প্রাণত্যাগ করুক্, স্বার্থপরের বজ্র কঠোর হৃদয় তাহাতে বিগলিত হইবে না,—সে অবলীলাক্রমে চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় বিবিধ সুখসেব্য আহার্য্যে স্বকীয় বিশাল উদর-গহ্বর পূর্ণ করিয়া নিরুদ্বিগ্নমনে নিদ্রাসুখ উপভোগ করিবে! বস্ত্রাভাবে সকল লোক নগ্নাবস্থায় কাল যাপন করুক, স্বার্থপরের চক্ষে সে দৃশ্য বীভৎস বা লজ্জাজনক বলিয়া প্রতীয়মান হইবেনা,—সে নির্ব্বিকার চিত্তে বহুমূল্য বিচিত্র পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া আপন সুখে জগৎব্রহ্মাণ্ড সুখময় জ্ঞান করিবে।

স্বার্থপর সংসার গগনে ধূমকেতুর ন্যায় উপপ্লব সাধন করে। কোন সংসারে এক জন মাত্র স্বার্থপরের আবির্ভাব হইলে তাহার জ্বালায় অনেককে উৎপীড়িত হইতে হয়। অধুনা প্রায় প্রত্যেক সমাজে ও প্রত্যেক পরিবারেই এইরূপ এক একটি বা অনেকগুলি স্বার্থপরের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। হায়! কত উন্নত সমাজ, কত সোণার সংসার, শান্তির লীলানিকেতন ঐ সকল নর-প্রেতের পৈশাচিক উপদ্রবে শ্মশান ভূমিতে পর্য্যবসিত হইতেছে! উহাদের ক্রূরাচারে কত সরল প্রকৃতি সাধুভাবাপন্ন নরনারী বিষম দুর্ব্বিপাকে পতিত হইয়া অনুক্ষণ অনন্ত যন্ত্রণা উপভোগ করিতেছে, স্বার্থান্ধগণ তাহা একবার ভাবিয়াও দেখেনা।

স্বার্থপরগণের কর্ম্মক্ষেত্র নিতান্ত সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ নহে—বিশালতায় উহা আকাশ মণ্ডলের ন্যায় অসীম ও অনন্ত। কপটতা, চাটুকারিতা,

কৃতঘ্নতা, প্রগল্‌ভতা, বিশ্বাসঘাতকতাদি কতকগুলি কু-প্রবৃত্তি উহাদের অভীষ্ট সিদ্ধির অমোঘাস্ত্র। আপনাপন উদ্দেশ্যের চরিতার্থতায় উহারা পাত্রাপাত্রের বৈষম্য বিচার করে না। অসম্পর্কিত বা অজ্ঞাত কুলশীল লোক সমূহ তো উহাদের ক্রীড়া-কন্দুক হইতেই পারে, পরন্তু পরম প্রেমাস্পদ সুহৃদ্বান্ধব, সাক্ষাৎ দেবতা স্বরূপ জনক জননী এবং প্রাণ-প্রতিম সহোদর ভ্রাতৃবৃন্দ পর্য্যন্তও উহাদের নিকট পরিত্রাণ লাভে সমর্থ হয় না। স্বার্থপরেরা নিজ নিজ কৌশলজাল বিস্তার করিয়া লূতাতন্তু-কেন্দ্রগত ঊর্ণনাভের ন্যায় উদাসীনভাবে অবস্থান করে, অবিমৃষ্যকারী মানব মণ্ডলী অজ্ঞতা ও অপরিণামদর্শিতার বশবর্ত্তী হইয়া অতর্কিতভাবে উহাতে নিপতিত হয় এবং পরিণামে মক্ষিকার ন্যায় চরম দুর্দ্দশা উপভোগ করে। স্বার্থপরগণের গুণাবলী বর্ণন করিয়া শেষ করা সু-কঠিন। আমাদের উক্তির সত্যাসত্য অবধারণে কোন পাঠকের কৌতূহল উদ্রিক্ত হইয়া থাকিলে তাঁহাকে অধিক দূর যাইতে হইবে না। হয়ত দুই একটি প্রতিবেশীর বাটী অনুসন্ধান এবং স্বীয় সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই প্রকৃত তত্ত্বে উপনীত হইতে পারিবেন। ঐ দেখ, স্বর্থপরগণের জ্বালায় দেশে এবং গৃহে গৃহে কি ভীষণ অশান্তির অনল জ্বলিয়া উঠিয়াছে! ঐ দেখ, স্বার্থপরগণ করাল বদন ব্যাদান করিয়া যেন ধরণী মণ্ডলটা গ্রাস করিবার উপক্রম করিয়াছে। কি বিকট লালসা! কি সর্ব্বগ্রাসিনী বীভৎস প্রকৃতি!!

বিন্দু পরিমিত গো-মূত্র-সংযোগে যেমন বহু পরিমিত দুগ্ধ বিকৃতি-ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে, এক একটি স্বার্থপরের দৌরাত্ম্যেও সেইরূপ সমস্ত সমাজ জর্জ্জরিত ও অবনত এবং সেইরূপ বহু পরিবার বেষ্টিত কত সুখময় সংসার নিরানন্দের নিবিড় কুহেলিকাজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া নিরন্তর মলিন-ভাবে কালযাপন করিতেছে। হে স্বার্থান্ধগণ! তোমরা কি প্রকাণ্ড

অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করিয়াছ, কি বিষম বিপত্তির বীজ উপ্ত করিয়াছ, একবার তাহা অবলোকন কর!

আজকাল প্রায় প্রতিগৃহেই নানারূপ বিবাদ বিসংবাদ লাগিয়া আছে দেখিতে পাওয়া যায়। একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই ঐ সকল ব্যাপারের প্রকৃত তথ্য-নির্ণয়ে বিলম্ব হইবে না।—দেখিবে, প্রায় অনেক স্থলেই একমাত্র স্বার্থপরতাই ঐ সকলের মূলীভূত কারণ। সমাজ বিনাশ, জাতিত্ব নাশ, হিংসা বিদ্বেষ, গৃহ-বিচ্ছেদ, ভ্রাতৃভেদ, পিতাপুত্রে অকৌশল, ঐ এক স্বার্থপরতারই প্রকট পরিণতি। স্বীকার করি, ঐ সমুদায় ব্যাপারে আরও অনেক কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু আমরা এমন অনেক স্থলে কেবল স্বার্থপরতা হইতেই ঐ সকল ব্যাপার সমুদ্ভুত হইতে দেখিয়াছি।

প্রাচীন লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্বে এক একটি পরিবারে শতাধিক লোক একান্নে প্রাতপালিত হইত। এক দিনের জন্যও কেহ কাহারও সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইত না। মনোমালিন্য বা দ্বেষাদ্বেষীর ভাব মুহূর্ত্তের জন্যও কাহারও মনে স্থান পাইত না। কেহ অধিক উপার্জ্জন করিলে এবং সেই উপার্জ্জিত অর্থ পরিবারস্থ অপরাপর উপায়ক্ষমগণের ভরণপোষণে ব্যয়িত হইলে উপায়ক্ষম ব্যক্তি অপব্যয় বলিয়া বোধ করিত না। তখন "একে আনে দশে খায়" এই কথা প্রত্যেক লোকের মুখে শোনা যাইত। এখন কিন্তু আর ঐ সকল ভাব প্রায় কোন স্থানেই দেখা যায় না। কদাচিৎ কোন কোন স্থানে দুই একটি নিঃস্বার্থ মহাপুরুষ দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা সাগরের সহিত শিশিরের তুলনার ন্যায়। স্বার্থের প্রবাহ এখন প্রত্যেক লোকের শিরায়২ ধমনীতে২ পরিব্যাপ্ত, স্বার্থের অপ্রতিহত প্রভাব এখন দিগদিগন্তে বিস্তারিত।

সংসারে সকলেই কিন্তু সমগুণ সম্পন্ন হয়না,—কেহ পণ্ডিত, কেহ মূর্খ, কেহ সবল, কেহ দুর্ব্বল, কেহ সক্ষম, কেহ অক্ষম হইবেই হইবে।

তবে কি পণ্ডিত মূর্খকে উপদেশ দিবে না? সবল দুর্ব্বলকে রক্ষা করিবে না? সক্ষম অক্ষমকে প্রতিপালন করিবে না? সকলেই স্ব স্ব স্বার্থে অন্ধ হইয়া থাকিবে? কখনই নয়। এরূপ ব্যবহার মঙ্গলময় বিধাতার মঙ্গল-নীতির অনুমোদিত নহে। আচ্ছা ভাই! তুমি না হয় বহু অর্থ উপার্জ্জন কর, কিন্তু বল দেখি, ঈশ্বর কি কেবল তোমারই উপভোগের জন্য ঐ সকল অর্থ তোমায় প্রদান করেন? তোমার হস্ত দিয়া তাঁহার অন্য কোন অভিপ্রায় সিদ্ধির কি কোন সম্ভাবনা নাই?

যদি সংসারে একতা স্থাপন করিতে চাও, যদি একান্নবর্ত্তিতার অমৃতময় ফলের রসস্বাদে বাসনা থাকে, তবে সর্ব্বাগ্রে স্বার্থপরতার বিসর্জ্জনে বদ্ধপরিকর হও। যাহাতে সকল বিষয়ে সাধারণের স্বার্থ সমভাবে বিদ্যমান থাকে, সরল প্রাণে সেইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর, অপরকে ফাঁকি দিয়া কোন বিষয় আত্মসাৎ করিবার অভিলাষ পরিত্যাগ কর দেখিবে—সকল অশান্তি অন্তর্হিত হইয়া সংসার স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইয়াছে।

আর একটি কথা। হে স্বার্থপর! তুমি এমন মনে ভাবিওনা যে চিরদিন অপরকে নিগৃহীত করিয়া ইষ্ট সাধন করিতে পারিবে। হইতে পারে তোমার দুর্ব্ব্যবহারে তাঁহারা কিছুদিন কষ্ট ভোগ করিবে, কিন্তু তাহাদিগকে চিরদিন এই কষ্ট ভোগ করান কি ন্যায় বিচারক জগদীশ্বরেরও অভিপ্রেত হইবে? কখনই নয়। দুষ্টের পতন ও শিষ্টের অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী। "যথা ধর্ম্ম তথা জয়" শাস্ত্রের সজীব সত্য বাক্য। অতএব বলিতেছি, হে স্বার্থপরগণ, ধর্ম্মে লক্ষ্য রাখ, সর্ব্ব ধ্বংসী স্বার্থপরতা হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা কর।

আদর্শ নেতা।

দশম প্রস্তাব।

পতিত এবং ভাগ্যহীন জাতির নেতা হইবার উপযুক্ত কে? নেতা কাহাকে বলে? নেতার কর্ত্তব্য কি? মৃতপ্রায় জাতিকে জাগ্রৎ এবং জীবন্ত করিয়া যিনি সৌভাগ্যের উন্নতসিংহাসনে সংস্থাপিত করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে পতিত জাতির নেতা হইবার উপযুক্ত। পতিত, দলিত এবং আত্মবিস্মৃত জাতির নেতা চরিত্র-মহিমায় এবং গুণ-গরিমায় আপনাকে সকলের হৃদয়াসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবেন। তাঁহার জ্বলন্ত এবং জীবন্ত প্রভাবে, তাঁহার তেজঃপুঞ্জময় বীরত্ব ও মহত্ব ব্যঞ্জক মূর্ত্তিতে, তাঁহার অপ্রতিহত গতি কর্ম্মোদ্যমের প্রাবল্যে, তাঁহার নবপ্রাণ সঞ্চারিণী তেজঃ বিভাষিণী বাণীতে, তাঁহার হিমাদ্রি সদৃশ অটল প্রতিজ্ঞা ও লক্ষ্যের স্থিরতায়, তাঁহার জাতীয় হিতৈষণার মূর্ত্তিমান উদ্দীপ্ত অনুরাগে,এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার আত্মত্যাগের বিস্ময়োৎপাদক সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্তে আত্মভ্রষ্ট, দীনতা দাসত্বের পাষাণ পেষণে একান্ত পিষ্ট, ক্ষীণপ্রাণ হীনচেতা এবং ক্ষুদ্রাশয় অধঃপতিত জাতি অগ্নি সংযোগে বারুদের ন্যায়—বর্ষাগমে স্রোতস্বিনীর ন্যায়, অথবা বসন্তাগমে উদ্যানের শ্যামল-সৌন্দর্য্য বিভঙ্গের ন্যায় জ্বলিত প্রবাহিত বা বিস্ফুরিত হইয়া উঠে তিনিই পতিত জাতির প্রকৃত আদর্শ-নেতা। মূর্খ জাতিকে যিনি জ্ঞানী, কাপুরুষ জাতিকে যিনি বীরজাতি, দুর্ব্বল জাতিকে যিনি প্রবল, লক্ষ্যভ্রষ্ট জাতিকে যিনি স্থিরলক্ষ্য এবং নীচাশয় জাতিকে যিনি মহাশয় করিয়া দিতে পারিবেন তিনিই প্রকৃতপক্ষে পতিত জাতির নেতা বা উদ্ধারকর্ত্তা। তিনিই নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার উপযুক্ত। তিনিই

নেতৃ পুরুষের পূজা ও দেবতুর্ল্লভ সম্মান গ্রহণ এবং অমরত্বের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিবার উপযুক্ত পাত্র। তিনি বৈরাগ্যে দরবেশ, এবং কর্ম্মে সৈনিক পুরুষ হইবেন। বিষয়াসক্তি এবং ভোগ-লালসা তাঁহার চিন্তা এবং কল্পনাকেও স্পর্শ করিতে পারিবে না! তিনি বিশ্ব-বিপদ হন্তা মঙ্গলময় পরমেশ্বরে সমাহিতাত্মা হইয়া সর্ব্ব প্রকার ভয়-ভীতি এবং আপদ বিপদ পদদলিত করিয়া গোমুখী নিঃসৃত পূত-জাহ্নবী ধারার ন্যায় নানা বাধা বিঘ্ন বিপ্লাবিত করিয়া প্রশান্তমনে প্রবাহিত হইবেন। এই প্রকার সার্ব্বভৌমিক ও সার্ব্বজনীন আদর্শ ব্যক্তি যখন কোনও জাতিকে কর্ত্তব্যপথে পরিচালিত করিতে প্রস্তুত হন, তখনই পতিত এবং দলিত জাতি বীরগর্ব্বে মৃত্যু-শয্যা হইতে পুনরুত্থান করিয়া জগতে আপনার বিজয়-গৌরব-বিমণ্ডিত পতাকা উড়াইয়া দেয়। এবম্প্রকারের স্বর্গীয় শক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ যে জাতির ভিতরে জন্ম গ্রহণ করেন, সে জাতি নিশ্চয়ই অভ্যুত্থান করে, কিন্তু এইরূপ নেতা বিশ্বেশ্বরের বিশেষ কৃপাতেই আবির্ভূত হন।

পতিত জাতির উদ্ধারের উপায় কি?

দীর্ঘকালের একটা পতিত এবং আলস্য জড়িত জাতিকে উন্নতি ও অভ্যুত্থানের মার্গে সমাকৃষ্ট করিতে হইলে একটি সমুন্নত লক্ষ্য স্থির করা আবশ্যক। উচ্চ লক্ষ্য না হইলে মন কখন উচ্চ হয় না। মন উচ্চ না হইলে জাতিও কখন উচ্চ হইতে পারে না। উচ্চ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ও প্রবল না হইলে জগতের প্রাকৃতিক বিধানানুযায়ী অস্তিত্ব ও আপনার স্বত্ব স্বামিত্ব রক্ষণ করা অসম্ভব। এ জগতে দুর্ব্বলের স্থান নাই বলিলেই চলে। যে দুর্ব্বল—যে অক্ষম—যে পতিত, তাহার জীবনধারণ কেবল প্রবলের

সুখ সৌভাগ্য এবং উদর পূর্ত্তির জন্য। ইহাই জগতের ধর্ম্ম—ইহাই ঐশী বিধান। সুতরাং কিছুতেই এই বিধানের ব্যতিক্রম সম্ভব নহে। দুর্ব্বল চিরকালই অত্যাচারিত এবং অবিচারিত হইবে! হীন যে—ক্ষুদ্র যে, চিরকালই সে পদ-দলিত এবং ঘৃণিত হইবে। সহজ ও সরল কথায়, পরাধীনকে স্বাধীনের কাছে, মূর্খকে পণ্ডিতের কাছে, দরিদ্রকে ধনীর কাছে, দুর্ব্বলকে সবলের কাছে, পাপীকে ধার্ম্মিকের কাছে চিরকালই ক্ষুদ্রতা, বাধ্যতা ও অধীনতা স্বীকার করিতেই হইবে। আর ক্ষুদ্র বাধ্য ও অধীন হইলে পরের অনুগ্রহের উপর তাহাকে নির্ভর করিয়া বাঁচিতে হইবে। পরের অনুগ্রহে বাঁচিতে হইলে ধ্বংস অনিবার্য্য; যেহেতু আত্ম-রক্ষণ এবং আত্ম-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা জগতের স্বাভাবিক নিয়ম বলিয়া প্রবল দুর্ব্বলকে আপনার অনিচ্ছা স্বত্বেও গ্রাস করিতে বাধ্য হয়। দুর্ব্বলের সর্ব্বস্ব শোষণ এবং পেষণ করিয়াই সবলের সবলতা, যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি প্রেম-পুণ্য এবং সাম্যের ধ্বজা উড়াইয়াও নিরীহ ও দুর্ব্বল পশু পক্ষী এবং মৎস্যকুল ধ্বংস করিয়া মানবের ব্যবস্থা দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। অন্য দিকে সিংহ শার্দ্দূল ভল্লুক প্রভৃতিকে ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক হারামের ব্যবস্থা দিয়া অব্যাহতি লাভ করিয়াছে। জ্ঞানী পাঠক বুঝিয়া দেখ, বিশ্বের প্রকৃত ধর্ম্ম কি? আত্ম প্রতিষ্ঠা, আত্ম রক্ষা ও আত্ম প্রাধান্যই বিশ্বের ধর্ম্ম। মানুষ সমাজগত হইয়া বাস করে বলিয়া স্বজাতি, স্বধর্ম্মী এবং স্বদেশীকে এই প্রাধান্য ও এই প্রতিষ্ঠা দিতে বাধ্য হয়। এখান হইতেই জাতীয় একতা, জাতীয় প্রেম ও জাতীয় উন্নতির সূচনা। এই জাতীয় উন্নতির দিব্যোজ্জ্বল আলোক প্রজ্জ্বলিত করিয়া সমগ্র জাতির আবাল বৃদ্ধ যুবক যুবতী এবং উচ্চ নীচ, জ্ঞানী ও মূর্খ, ধনী ও নির্ধন সকলকে আকৃষ্ট করাই জাতীয় অভ্যুত্থানের একমাত্র উপায়। নানাবিধ পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে যেমন রক্ত পরিষ্কারক ঔষধ

একমাত্র ব্যবস্থেয়, তেমনি নানা বিষয়ে পতিত এবং নানা পথে ভ্রান্ত জাতির চক্ষুর সম্মুখে এক মহা অভ্যুত্থানের মহোজ্জ্বল আলোক ভাণ্ড প্রজ্জ্বলন করাই প্রকৃত ত্রাণ-কর্ত্তা নেতার কার্য্য। প্রথমতঃ এই আলোকে বহু লোকের চক্ষুই ঝলসাইয়া যায়, জনসাধারণ মহা হট্টগোল উপস্থিত করে, অনেকে আলো নির্ব্বাণের জন্য বদ্ধপরিকর হয়, কিন্তু এই আলোক-ভাণ্ড প্রজ্জ্বলনকারী নেতৃ পুরুষ কিছুতেই বিচলিত না হইয়া আলোক প্রজ্জ্বলিত করিতেই প্রাণান্ত চেষ্টা করেন। দেখিতে দেখিতে সহস্র বজ্রাগ্নি তুল্য জ্বালাময় প্রভাপুঞ্জে যাহাদের চক্ষু বিদগ্ধ করিতেছিল, কিয়ৎকাল পরে সে জ্বালার তেজঃ কমিয়া আসে এবং পরে ধীরে ধীরে তাহা সহনীয় এবং শোভনীয় হইয়া উঠে। অতঃপর আর কিছুকাল পরে জনমণ্ডলী সে আলোক-উৎসবে প্রীত ও তৃপ্ত না হইয়া সেই জাতীয় অভ্যুত্থান-রূপ মহা শক্তি-সঞ্জীবনীর অগ্নি-হ্রদে অদম্য সাধনা এবং আত্মোৎসর্গের ইন্ধন সংযোগে মহা কালানল প্রজ্জ্বলিত করে। সেই প্রলয়ঙ্কর মহা কালানলের জ্বলজিহ্ব-শিখা সমগ্র বাধা বিঘ্ন এবং শত্রুতার জঞ্জাল জাল ভস্মীভূত করিয়া নব জীবন এবং নব উত্থানের বিজয় পতাকা নীলাকাশে উড়াইয়া দেয়। তখন সমগ্র জগৎ তাহাদের চরণতলে প্রণত জানুতে অবলুণ্ঠিত হইয়া পড়ে। আর সৌভাগ্যের কৌমুদীচ্ছটায় জাতীয়-জীবন-উদ্যান আলোকিত পুলকিত এবং সুশোভিত হইয়া উঠে।

স্ত্রীশিক্ষা ও পর্দা।

একাদশ প্রস্তাব।

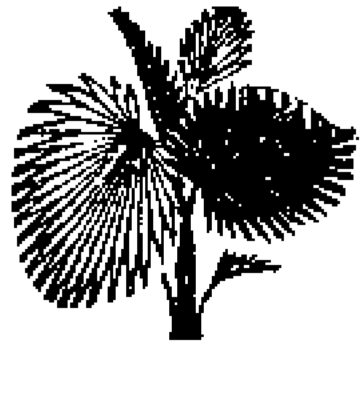
এই মরুময় সংসার-কাননে আমাদের চির হিতৈষিণী অর্দ্ধাঙ্গী, জীবন-রণের প্রধান সঙ্গিনী গৃহ-কর্ত্রীদিগকে অশিক্ষিত রাখিয়া আমাদের উদাসীন থাকিবার আর সময় নাই। এই ঘোর দুর্দ্দশার চরম সময়ে বিষম অধঃপতন যুগে জীবন মরণের জটিল সমস্যার ভীষণ অকূল সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া—এখনও যদি তাহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষিতা না করি, তাহা হইলে আমাদের কিন্তু অগ্রপশ্চাৎ হঠাৎ এরূপ ভাবে অধিক দিন চলিবে না। তবে শীঘ্রই আমাদের ফাঁপড়ে পড়িয়া পিঞ্জিরাবদ্ধ টিয়া পাখীর ন্যায় 'টেঁ' 'টেঁ' করিয়া অসদ্ব্যবহারে পৈতৃক জীবনটার অবসান করিতে হইবে।

বাস্তবিক রমণীদিগকে সৎ শিক্ষা ও সৎ সাহসে বিভূষিত করিতে না পারিলে আর আমরা অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিব না। যাহারা আমাদিগকে জুজুর ভয় দেখাইয়া আঁচলে লুকাইতে পারেন এবং রণচণ্ডী বেশে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া অবতীর্ণ হইতে পারেন—তাহারা গৃহ-কোণে আঁতুর হইয়া পড়িয়া থাকিলে চলিবে কেন? সমাজের সুধীগণ একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন!

এস্থলে আমরা স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলন করিতে গিয়া তাহাদিগকে পশু পক্ষীর মত স্বাধীনতা দিয়া থাকিতে পারিব না, ইহাও স্থির নিশ্চয়। তখন আবার এক নূতন বিপদ মাথায় করিয়া হাঁফাইয়া হাঁফাইয়া প্রাণ হারাইতে হইবে। তখন—"যে ছিলাম বসিয়া, নাশ

করিলাম বৈস্ত লাগাইয়া"র দশায় পড়িয়া দুই নয়নে সরিষার ফুল দেখিতে হইবে। অতএব পর্দ্দানিশীন জানানা স্কুল কলেজ স্থাপন করিতে হইবে। জানানা শিক্ষয়িত্রী দ্বারা ঐ সকল স্কুল কলেজের শিক্ষা-দীক্ষার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে। তাহাদের কলেজে পড়িয়া উপাধি লাভ করিবার তো কোন আবশ্যকতা অনুভব করিয়া উঠিতে পারি না? মোটের উপর শিক্ষিতা হইলেই তো চলে। পূর্ব্বকালের রমণীগণ এম, এ,—বি, এ, পাশ না করিলেও তো আদর্শ প্রদর্শনে জগতে অমর ও ধন্য হইয়া গিয়াছেন। আমাদের বর্ত্তমান রমণী সমাজকে পবিত্র নারী মর্য্যাদা বজায় রাখিয়া সেই আদর্শ বুকে ধরিয়া সেই পথের পথিক হইতে হইবে। নতুবা তাহারা উঠিতে গিয়া পড়িয়া যাইবেন; জাগিতে গিয়া মজিয়া মরিবেন। যেই তিমিরে সেই তিমিরে ঘুরিয়া পড়িবেন।

মিসেস, আর, এস, হুসেনের প্রস্তাবমত রমণী সমাজকেই এই ক্ষেত্রে অলঙ্কার পত্রের সখ সঙ্কোচ করিয়া প্রথম আবির্ভূত হইয়া কার্য্যবৃত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তৎপর যদি তাহাদের নিদ্রাতুর স্বামী, ভাই, পুত্রগণ সাহায্য করেন। নতুবা আমরা আজকাল সমাজের হাল্‌টা ধরিয়া যেরূপ টানাটানি করিতেছি, তাহাদিগকে সঙ্গিনী করিয়া কার্য্যভার হাল্‌কা করিবার অবসর আমাদের কোথায়!



ইস্‌লাম ও সংসার ধর্ম্ম।

দ্বাদশ প্রস্তাব।

প্রিয় পাঠক এখন একটি গুরুতর অথচ সহজে বোধগম্য বিষয় লইয়া আপনাদের নিকট উপস্থিত হইতেছি। আশা করি আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিষয়টি একটু স্থিরভাবে ভাবিয়া দেখিবেন।

আপনারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন মুসলমানগণ এক সময় উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আসীন হইয়া জগৎময় ইস্‌লামের আলোক বিতরণ করিতেছিল, আর সমস্ত জগৎ মুগ্ধপ্রাণে তন্ময়চিত্তে তাহাদের নিকট সর্ব্ব বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিত। মুসলমানগণ তখন সমস্ত জগতের শিক্ষাগুরু ছিলেন, তাঁহাদের নিকট শিল্প বাণিজ্য, দর্শন বিজ্ঞান, সাহিত্য ইতিহাস, অঙ্ক জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া বর্ত্তমান ইউরোপ আজ উন্নতির উচ্চ সোপানে সমাসীন।

অতীতের কথা ভাবিতে ভাবিতে আপনারা যতই বর্ত্তমানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবেন ততই আপনাদের মনে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইবে। মুসলমানদিগের অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থার তারতম্য দর্শনে আপনি বিস্মিত হইবেন। মনে হইবে হায়! যে জাতি এক সময় শৌর্য্যে, বীর্য্যে, জ্ঞানে ও সভ্যতায় জগতের বরণীয় ছিল, যাঁহাদের প্রবল প্রতাপ ও অতুলনীয় উদারতা দর্শনে সমস্ত জগৎ স্তম্ভিত হইয়াছিল, আজ সেই জাতির অবস্থা এত শোচনীয় কেন হইল? যাঁহারা সর্ব্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া সমস্ত জগতের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া জগৎময় সভ্যতার স্নিগ্ধ আলোক বিতরণ করিয়া এক নূতন যুগের অবতারণা করিয়াছিলেন, কোন্ দোষে আজ তাঁহারা অবনতির

সর্ব্ব নিম্নস্তরে পতিত হইয়া জগতের ঘৃণা ও অবজ্ঞার ডালি মাথায় করিয়া জীবন্মৃত অবস্থায় কালযাপন করিতেছে?

মুসলমান সমাজের কথা ভাবিতে যাইয়া আপনাদের মনে এরূপ প্রশ্নের উদয় হওয়া স্বাভাবিক। এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলি যে সব গুণের প্রভাবে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ উন্নতির চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, আমাদের মধ্যে সেই গুণের অভাব হওয়াতেই এরূপ শোচনীয় পতনের কারণ হইয়াছে। পাঠক শিক্ষা বিস্তার, একতা স্থাপন, অর্থ সমাগম, শিল্প বিজ্ঞান চর্চ্চা প্রভৃতি এবং ধর্ম্মভাবের অভাবই আমাদের সমাজের শোচনীয় পরিবর্ত্তনের একমাত্র কারণ।

ইস্লাম রূপ সুবৃহৎ প্রাসাদটি প্রধানতঃ পাঁচটি সুদৃঢ় স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সমস্ত স্তম্ভগুলির ভিত্তি যতদূর দৃঢ় হইবে, প্রাসাদটির স্থায়িত্ব ঠিক সেই পরিমাণে নিঃসন্দেহ হইবে। কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ ও জাকাত এই পাঁচটি ফরজ বা অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য বা বিধানই ইস্লামরূপ সুবৃহৎ প্রাসাদের স্তম্ভ। মুসলমান সমাজে পাঁচটি বিষয় যত মনোযোগের সহিত প্রতিপালিত হইবে, সমাজ ঠিক সেই পরিমাণে উন্নত হইবে। যতদিন মুসলমান পাঁচটি ফরজের প্রতি অবিচলিত ভক্তি রাখিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে প্রয়াস পাইবে, ততদিন মুসলমান সমাজ কি আধ্যাত্মিক কি আধিভৌতিক কোন বিষয়েই অবনত হইবে না, শত বিঘ্ন বাধাও মুসলমানকে লক্ষ্য ভ্রষ্ট করিতে পারিবে না। কিন্তু এই পাঁচটি ফরজের প্রতি অমনোযোগিতা আসিলেই মুসলমানের সর্ব্বনাশ হইবে—মুসলমান অধঃপাতে যাইবে, তবে আর শত চেষ্টাতেও জীবনের লক্ষ্যপথ আবিষ্কার করিতে পারিবে না।

আধ্যাত্মিক বিষয় বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। দেখা যাউক সংসার ধর্ম্মে এই পাঁচটি ফরজ হইতে কি উপকার লাভ করিতে পারি।

প্রিয় পাঠক! মুসলমান বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে হইলেই আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে, সর্ব্বপ্রযত্নে, সর্ব্বান্তঃকরণে কলেমা শিক্ষা করিতে হইবে। ফলতঃ মুসলমান মাত্রকেই বাধ্য হইয়া সর্ব্ব প্রথমে কলেমা শিক্ষা করিতে হয়—কলেমা শিক্ষা না করিয়া মুসলমান হওয়া যায় না।

কিন্তু এই কলেমার আবশ্যকতার মূলে আমরা শিক্ষার আবশ্যকতা দেখিতে পাই। শাস্ত্রের বিধানুসারে কলেমা শিক্ষা করিতে হইলে তাহা শুধু মুখস্থ করিলে চলিবে না। প্রতি অক্ষরের উচ্চারণ এবং প্রতি শব্দের বিশেষ অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমাদিগকে কলেমা শিক্ষা করিতে হইবে। কলেমার সুরের সহিত নিজের প্রাণের সুর মিলাইয়া পরে সংসারময় পরিব্যাপ্ত অনন্ত সুমহান ঐশী সুরের সহিত তাহার ঐক্য সম্পাদন পূর্ব্বক পরম করুণাময় অনন্ত দয়াল খোদাতালার নৈকট্য লাভের প্রয়াস পাইতে হইবে। যখন কলেমার সুরের সহিত নিজের প্রাণের সুর আপনা হইতেই বাজিয়া উঠিবে, যখন সেই স্বজাত সুরের সহিত জগতের অনন্ত প্রাণের সুর মিলিত হইয়া একত্ব প্রাপ্ত হইবে তখনই কলেমা শিক্ষা সুসম্পন্ন হইবে। এই প্রকারে কলেমা শিক্ষা করিতে পারিলেই প্রকৃত মুসলমান হওয়া যায়।

এইরূপ অপর চারিটি বিষয়ের সহিতও শিক্ষা ও প্রাণের একাগ্রতা বিজড়িত রহিয়াছে। সনাতন ইস্‌লামের প্রত্যেক ধর্ম্ম বিধির সহিতই শিক্ষার ঘনিষ্টতম সম্বন্ধ রহিয়াছে। মোট কথা মূর্খ লোক ইস্‌লামের কিছু বুঝিতে পারেনা, ইস্‌লামজগতের কোনও উন্নতি সাধন করিতেও পারে না। ইস্‌লামের মূলমন্ত্র শিক্ষা ও সাধনা। এইজন্য ইস্‌লাম ও সংসার ধর্ম্মে ঐক্য পরিলক্ষিত হয়।

উপসংহার।

বর্ত্তমান সময় পৃথিবীর উন্নতি যুগ। পৃথিবীর সকল জাতিই দ্রুতবেগে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু ইস্‌লামের উন্নতি স্বতন্ত্র জিনিষ, পার্থিব উন্নতির সহিত পারমার্থিক উন্নতিও ইস্‌লামের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। এই দুইয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা না পাইলে মুসলমান জাতির প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। মুসলমানদিগের পক্ষে পরকালই একমাত্র লক্ষ্যস্থল। যাহা হউক, আমাদের ধর্ম্মাচার্য্য আলেমগণই আমাদের একমাত্র পথপ্রদর্শক এবং জাতীয় নেতা। আলেমমণ্ডলী যদি দেশ কাল পাত্র বুঝিয়া মুসলমান জাতির উন্নতির জন্য অগ্রসর হইতেন, তবে আমাদের বর্ত্তমান দুর্গতি দেখিতে হইত না।

শিক্ষা।

১। শিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। মোক্তব, মাদ্রাসা, স্কুল ইত্যাদি যাহাতে প্রত্যেক জেলার সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই কার্য্যের জন্য মুসলমান ভ্রাতা ও ভগ্নীদিগকে মুক্তহস্ত হইতে হইবে। নিজেদের আহার পোষাক ইত্যাদির ব্যয় যেমন অত্যাবশ্যকীয়, সেইরূপ সমাজের জন্য শিক্ষা ব্যয় আবশ্যকীয় মনে করিতে হইবে। নিজে না খাইয়াও সন্তানবর্গের শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। যথাসম্ভব বালিকাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাও করিতে হইবে। ইস্‌লাম ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত পর্দ্দার গৌরব বজায় রাখিয়া বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে। কেবল নিম্নশিক্ষা দান করিয়া নিরস্ত থাকিলে চলিবে না। নিম্নশিক্ষা প্রাপ্ত ছাত্রদিগের কতক যাহাতে উচ্চ ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিয়া উর্দ্ধদিকে উত্থিত হইতে

পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কতক ছাত্রকে শিল্প ও কৃষি বিদ্যালয় সমূহে, কতক ছাত্রকে মনুষ্য চিকিৎসা ও পশুচিকিৎসা বিভাগে প্রবিষ্ট করাইতে হইবে। মোক্তব ও মাদ্রাসার ছাত্রদিগের মধ্যে কতককে উচ্চ শিক্ষা লাভার্থ দেওবন্দ মাদ্রাসায়, নদুয়ায়ে দারুল উলুমে, কানপুরের মাদ্রাসায় ইলাহিয়াতে, কতক দিল্লীর হাকিমী বিদ্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। এই সকল উপায় অবলম্বন না করিলে, সমাজের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইবে না।

সদাশয় গবর্ণমেণ্টের দয়ায় প্রত্যেক জেলায়ই কলেজ আছে, কিন্তু তাহাতে সামান্য পরিমাণ ছাত্র দৃষ্ট হয়। হাওড়া শিবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ রহিয়াছে, কিন্তু মুসলমান ছাত্র উহাতে অধ্যয়ন করিতেছে অতি অল্প। শিক্ষার অভাবে কোনও জাতি রাজনৈতিক অধিকার লাভ করিতে সমর্থ হয় না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। মুসলমানগণ যদি শিক্ষা ক্ষেত্রে এইরূপ উদাসীন থাকে, তবে তাহাদের সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক স্বত্ব বিনষ্ট হইবে। তাহারা আর কোন কালেই মাথা তুলিতে পারিবে না। ধনী মুসলমানগণ প্রতিবেশী মুসলমান ছাত্র মণ্ডলীর সাহায্য করা ত দূরে থাকুক, তাঁহারা স্ব স্ব সন্তান সন্ততির শিক্ষা বিষয়েও নিতান্ত উদাসীন। কাজেই তাঁহাদের সন্তানাদি শিক্ষার অভাবে বওয়াটে, ঘোর বিলাসী ও অপরিণামদর্শী হইয়া থাকে। পৈতৃক ব্যবসায় বাণিজ্য রক্ষা করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। শুধু এই কারণেই অনেক মুসলমান জমিদারের জমিদারী এবং ব্যবসায়ীর ভাল ভাল কারবার নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং যাইতেছে। শিক্ষার অভাবে ইহাদের হৃদয় নানা দোষে কলঙ্কিত। জাতীয় পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিতেও ইহারা নারাজ! অনেকেই "হিন্দু বাবু" সাজিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন।

ইস্‌লাম-চিত্র পাঠ করিয়া ইস্‌লামের কল্যাণে যদি মুসলমানগণ আপনাদের উন্নতির পথ প্রশস্ত করিতে পারেন, ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইতে পারেন, শিক্ষাক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রসর হইতে পারেন, ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি ও শিল্প কৃষি কার্য্যের উৎকর্ষ বিধান করিতে পারেন, তবেই আশার কথা। সর্ব্ব শ্রেণীর মুসলমানগণ পরস্পর ভ্রাতৃভাবে সম্মিলিত হইয়া কার্য্য করিলে, এইরূপ আশা করা অসঙ্গত হইবে না।

সভা সমিতি।

আজ কাল সভা সমিতি দ্বারাই জাতীয় উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হইতেছে। অন্য ধর্ম্মাবলম্বী লোকের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায় যে, তুরস্ক, মিশর, সিরিয়া এমন কি ভারতবর্ষের পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশে শত শত আঞ্জেমন বা সভাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া তত্রত্য অধিবাসিদিগের জাতীয় উন্নতির পথ সুপ্রশস্ত করিতেছে। আঞ্জেমন দ্বারা প্রথমে প্রত্যেক জেলার মুসলমান ভ্রাতৃ মণ্ডলীর মধ্যে একতা ও ভ্রাতৃভাব স্থাপন হওয়া আবশ্যক। ধনী, দরিদ্র, বিদ্বান ও মূর্খ নির্ব্বিশেষে সকলেই ভ্রাতৃভাবের সুদৃঢ় রজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া একযোগে কার্য্য করিবেন। একতা বলে মুষ্টিমেয় আরব পৃথিবীতে কি কাণ্ডই না করিয়াছিলেন। তাহা আপনাদের স্মরণ করা উচিত। একতা বলে মুসলমানগণ পশ্চিমে স্পেন দেশ হইতে পূর্ব্বে চীন দেশ পর্য্যন্ত এবং উত্তরে উত্তর মহাসাগর হইতে দক্ষিণে ভারত মহাসাগর পর্য্যন্ত সুবিশাল ভূভাগে ইস্‌লামের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন ও পবিত্র ধর্ম্মের পূতবাণী ঘোষণা করিয়া ছিলেন। আজ আমাদের সে মহান্ শক্তি কোথায় গেল? এক্ষেত্রে আমাদিগকে দৃঢ়তার সহিত বলিতে হইতেছে যে, পবিত্র কোরান শরীফের আদেশ এবং হজরত রেসালত পানার পবিত্র উপদেশ ভুলিয়া

গিয়া আমরা সকল শক্তি এবং সকল গুণ হারাইয়া বসিয়াছি। আমাদের মধ্যে সে পবিত্র একতা ও ভ্রাতৃভাব কোথায়? সে পবিত্র ধর্ম্মবল ও খোদার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস কোথায়? সে অটল সাহস ও সহিষ্ণুতা, সে অমানুষিক দৃঢ়তা ও নিঃস্বার্থপরতা, সে গুরুজন ও আলেমমণ্ডলীর প্রতি ভক্তি কোথায়? আমাদের সর্ব্বগুণালঙ্কৃত নেতৃমণ্ডলীই বা কোথায়? আমরা এক্ষণে রাখালবিহীন মেষযূথের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছি। কাজেই নানা প্রকার হিংস্র শ্বাপদের হাতে পতিত হইয়া আমরা তাহাদের "শিকার" হইতেছি। ধর্ম্মের ভয় আমাদের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। সর্ব্বপ্রকার "শেরেক" এবং "বেদাত" আমাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, আমাদিগকে পৌত্তলিক ও জড়োপাসক করিয়া তুলিয়াছে। আবার ধর্ম্মশিক্ষা বিবর্জ্জিত এক ঘোর পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে, আমাদের ইংরেজী শিক্ষিত নব্য যুবকদিগের মধ্যে একদল ধর্ম্মদ্রোহী বা নাস্তিকের সৃষ্টি হইয়াছে। মুরুব্বিদিগের অমনোযোগ ও ত্রুটি এবং শিক্ষা প্রণালীর দোষে এই সকল মারাত্মক ব্যাধির উৎপত্তি হইয়াছে। আলেমমণ্ডলীর যোগ্যতার অভাবে এই জাতীয় পতনের বেগ অধিকতর প্রবল হইতেছে। জাল জুয়াচুরী, মিথ্যা মামলা মোকদ্দমা, নানা প্রকার নেশা ব্যবহার, সুদ গ্রহণ, উৎকোচ গ্রহণ, ব্যবসায়ে ভেল ও দাগাবাজী, পরপীড়ন, স্বজাতীয় ভ্রাতার শোণিত শোষণ, ব্যভিচার, বেশ্যাসক্তি, চুরি-চামারি, দস্যুতা, পরনিন্দা, পরগ্লানি, পরানিষ্ট সাধন ইত্যাদি যত প্রকার পাপকর্ম্ম ও পাপানুষ্ঠান আছে, তৎসমস্তই মুসলমান সমাজে প্রবিষ্ট হইয়া সমাজকে অন্তঃসারশূন্য, দুর্ব্বল ও বিশৃঙ্খল করিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং দিন দিনই জাতীয় অধঃপতন ঘটিতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষার অভাবই অধিকতর মারাত্মক হইয়া পড়িয়াছে। অপব্যয়িতা মুসলমানদিগের একটি প্রধান রোগ। এই

সংক্রামক রোগে অনেক মুসলমানের ভিটামাটী উৎসন্ন যাইতেছে। এই বঙ্গদেশে শত সহস্র "আয়মাদার" ছিলেন, অপব্যয়ের বাহুল্যে তাঁহাদের সে সমস্ত আয়মা আজ পরহস্তগত। ব্যবসায়িগণও অপব্যয়ে মুক্তহস্ত। তাঁহারা বিবাদ, বিবাহ ও অন্যবিধ উৎসবাদিতে অজস্র অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। এরূপ "ফজুল খরচ" খোদা ও রসুলের আজ্ঞার বিপরীত কাজ। মিতব্যয়ী হওয়া সকলেরই উচিত। ঐরূপ বৃথা কাজে বিপুল অর্থব্যয় করিয়া পাপী হইতেছেন, অথচ ধর্ম্মকার্য্যে ও শিক্ষাকার্য্যে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিলে ইহকালে সুনাম ও সুযশ এবং পরকালে উহার মহান্ সুফল নিশ্চয় ভোগ করা যাইবে।

ব্যবসায়।

সাধারণ শিক্ষায় হিন্দুদের সহিত মুসলমানদিগের তুলনা হইতে পারে না। শিল্প বাণিজ্যে মুসলমানদিগের সুনাম থাকিলেও উপযুক্তরূপ ব্যবস্থার অভাবে তাহার কোনরূপ উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে না। ব্যবসায় বাণিজ্য উপলক্ষে আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি সুদূর দেশ মহাদেশে অবস্থিতি করিতেছে বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিশেষতঃ অশিক্ষিত ভ্রাতৃগণ ব্যবসায় ক্ষেত্রে আশানুরূপ উন্নতি সাধন করিতে পারিতেছে না। আবার তাহারা প্রায় একইবিধ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া থাকে। অন্য দিকে আবার তত্রত্য স্বেচ্ছাচারিণী ও চরিত্রহীনা নারীদিগের পাল্লায় পড়িয়া অনেকে গোল্লায় যায়। ব্যবসায় বাণিজ্যের মুণ্ডপাত করে। অনেকেই ঘোর বিলাসী ও লম্পট হইয়া স্বজাতির মুখে কলঙ্ক কালিমা লেপন করিয়া থাকে। নচেৎ তাহারা যেরূপ সাহসে বুক বাঁধিয়া সাত সমুদ্র তের নদীর পরপারে গমন করিয়া থাকে,

তাহাতে তাহাদের সাহসকে ধন্যবাদ দিতে হয়। আজকাল ঐ সকল দেশের আইন কানুন এত কঠিন করা হইয়াছে যে, এই শ্রেণীর নূতন ব্যবসায়ী আর সেই সকল দেশে কিছুতেই প্রবেশ করিতে পারিবে না।

শিল্প।

শিল্প কাজের মধ্যে একমাত্র চিকনের কাজের যা কিছু নাম শুনা যায়। অন্যবিধ কাজের অস্তিত্ব অনুভূত হয় না। যে মাদুরের জন্য মেদিনীপুর জেলা বিখ্যাত, মুসলমানগণ সেই শিল্পে একবারে অনভিজ্ঞ, অথচ উহা একটি লাভবান শিল্প। সোণা রূপার অলঙ্কার, লৌহ-শিল্প, তাম্র বা পিত্তল-শিল্প, কাষ্ঠ-শিল্প, বংশ বা বাঁশের শিল্প এ সমস্ত বিষয়েও মুসলমানদিগের কোন অস্তিত্ব নাই। আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার শিল্প ও বাণিজ্য কার্য্যেই মনোযোগ প্রদান করিতে হইবে। মুদীর দোকান, বেনের দোকান, গোয়ালার ব্যবসায়, ময়রা বা হালুয়াইয়ের ব্যবসায়, কামার, কুমার ও ছুতারের কাজ এ সমস্তই করিতে হইবে। ব্যবসায় সম্বন্ধে অন্য জাতির মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে ভীষণ অধঃপতন অনিবার্য্য!

কলিকাতা ও ঢাকার দশ কুড়ি জন চর্ম্ম ব্যবসায়ী, দু দশ জন চর্ব্বিওয়ালা, বিশ পঞ্চাশ জন কাটা কাপড় এবং দশ পাঁচ জন বিলাতী ও দেশী কাপড় বিক্রেতা, বিশ পঞ্চাশ জন মনোহারী বা ষ্টেসনারী দোকানদার থাকিলেই কি দেশের উন্নতি সাধিত হইবে? ঐ শ্রেণীর ব্যবসায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া অসম্ভব, এমন কি ঐ সকল ব্যবসায়ী পূর্ব্বে যে পরিমাণ ছিলেন, অশিক্ষিত ও অপরিণামদর্শী উত্তরাধিকারীদিগের দ্বারা সেই সকল ব্যবসায়ীর অনেকেরই ব্যবসায়ের অবনতি বা অস্তিত্ব বিলুপ্তি ঘটিয়াছে। জুতার দোকান ও রুটী বিস্কুট প্রভৃতি কার্য্যেতে মুসলমানদিগের একচেটিয়া অধিকার ছিল, এক্ষণে তাহাও হিন্দুদিগের হস্তগত হইতেছে।

কোন কোন মুসলমানের ফায়ম হিন্দুর সহিত সংযুক্ত হইয়া, ক্রমশঃ হিন্দুদিগের হস্তগত হইবার উপক্রম হইয়াছে। অপরিণামদর্শী বিলাসী মুসলমানগণ যে সুচতুর কর্ম্মঠ ও বিলাসব্যসন পরিশূন্য হিন্দুদিগের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিবে, এ বিশ্বাসও আমাদের হয় না। আমাদের অতি লাভজনক চাটনী, মোরব্বা, আচারের ব্যবসাও হিন্দুরা কাড়িয়া লইয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি আমরা তাহাদের মিঠাই-মণ্ডাটুকু প্রস্তুত করিতে বা উহার ব্যবসায় চালাইতে সক্ষম হই নাই। ইহা অপেক্ষা আমাদের অপদার্থতা ও অকর্ম্মণ্যতার জ্বলন্ত প্রমাণ আর কি হইতে পারে? আমরা ব্যবসায়ের উন্নতির মূল সূত্র ভুলিয়া গিয়াছি। ব্যবসায়ীর সততা, শিষ্টতা, মিষ্টভাষিতা, এ সকল গুণ আমাদের মধ্য হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। হিন্দুগণ ঐ সকল গুণের অধিকারী হইয়া সহজে গ্রাহকদিগকে হস্তগত করিতেছে।

কৃষি।

কৃষিকার্য্যে এখন আর মুসলমানদিগের তেমন কিছু কৃতিত্ব আছে বলিয়া বোধ হয় না। ধান, আলু, পটল, ইক্ষু এই চতুর্ব্বিধ কৃষিকার্য্যে কতকটা অভিজ্ঞতা আছে বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু উন্নত প্রণালীতে ঐ সকল দ্রব্যের কৃষি করিতে তাহারা অসমর্থ। নারিকেল, সুপারি, আম ও কাঁঠাল ইত্যাদির উৎকৃষ্ট বাগান প্রস্তুত করিলে মুসলমানগণ প্রচুর লাভবান হইতে পারেন, কিন্তু এই সকল বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা, অধ্যবসায় এবং যত্ন চেষ্টা থাকা চাই। প্রত্যেক জেলায় যে পরিমাণ তাল গাছ আছে, যদি সকল অধিবাসীগণ তালের গুড় এবং মিশ্রি প্রস্তুত করিবার বন্দোবস্ত করিতে পারে, তাহা হইলে লক্ষ লক্ষ টাকা আয়ের পথ হইবার কথা। সুপারির উৎকৃষ্ট বাগান হইতে

হইলে, বরিশাল জেলার উত্তর শাহাবাজপুর কিম্বা নোয়াখালী জেলায় যাইয়া উহা দস্তুর মত শিক্ষা করিতে হইবে। কৃষি বিদ্যা একটি উন্নত শ্রেণীর বিদ্যা, উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে উহাতে সুফল লাভের আশা খুব কম। পানের বরোজ একটি মহা লাভজনক ব্যবসায়। অনেক স্থলেই প্রচুর পান উৎপন্ন হয়। কিন্তু একটি মুসলমানও বোধ হয় এ যাবৎ এ ব্যবসায় অবলম্বন করে নাই। উত্তর বঙ্গে রাজসাহী জেলায় শত শত মুসলমান পানের বরোজ প্রস্তুত করিয়া সহস্র সহস্র টাকা আয় করিতেছে। স্বদেশী আন্দোলনের পর মুসলমান বক্তাদিগের বক্তৃতায় বহু মুসলমান পানের বরোজ প্রস্তুত করিয়া প্রচুর লাভবান হইতেছে। প্রত্যেক জেলার মুসলমানগণ এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়া অর্থাগমের সদুপায় অবলম্বন করিবেন, এরূপ আশা করি। সর্ব্বপ্রকার ব্যবসায় বাণিজ্য ছাড়িয়া মুসলমানগণ ক্রমশঃ দরিদ্র হইতেছে, এ কথা সকলেরই বুঝা উচিত।

গৃহপালিত পশু।

তৎপরে গবাদি পশুর কথা। বর্ত্তমানে দেশে গবাদি পশুর যে শোচনীয় দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে উহার উন্নতির কোনও সদুপায় না করিলে ভবিষ্যত অতি ভয়ঙ্কর হইয়া দাঁড়াইবে। অর্থশালী লোক-দিগের মধ্যে যদি কেহ কেহ পশ্চিমের ভাল ভাল গাভী ও ভাল ভাল ষাঁড় আনাইয়া উন্নত প্রণালীতে গো পালন করেন, তবে তাঁহারা নিজেরা বিশেষ লাভবান হইতে পারেন এবং স্বজাতীয় ও স্বদেশবাসী ভ্রাতৃমণ্ডলীরও বিশেষ উপকার সাধিত হয়। যে কোনও কার্য্য বা যে কোনও ব্যবসায় উন্নত প্রণালীতে না করিতে পারিলে, তাহাতে সুফল লাভের আশা করা যাইতে পারে না। ইউরোপ, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও জাপানবাসিগণ

কৃষি ও গবাদি পশুপালনে কিরূপ উন্নতি সাধন করিয়াছেন, তাহা শুনিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়; শিল্পাদির ত কথাই নাই। গবর্ণমেণ্ট এদেশে কৃষি কলেজ ও কৃষি শিক্ষা ক্ষেত্র প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয় যে, মুসলমান যুবকগণ ঐ সকল কলেজে বা কৃষি শিক্ষা ক্ষেত্রে কার্য্য শিক্ষা করিতে অগ্রসর হইতেছে না।

ঐতিহাসিক তত্ত্ব।

শত শত সাধু, সুফী ও আলেমমণ্ডলীর দ্বারায় এই বঙ্গদেশ গৌরবান্বিত ছিল। তদ্ব্যতীত ইতিহাস প্রসিদ্ধ মুসলমান প্রধান স্থানের নাম জানা যায় বটে, কিন্তু সকল স্থানের বিষয় সম্যক্ অবগত হইবার কোনই উপায় নাই। প্রত্যেক জিলার মৃত্তিকার নিম্নে সহস্র সহস্র অলি আল্লাহ ও সাধু পুরুষের পবিত্র দেহ মিশাইয়া রহিয়াছে, অথচ কেহই তাহাদের ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন না।

আমার রোদন শেষ করিলাম। কাজ করা না করা দেশের সকলের ইচ্ছাধীন। এইগুলি অধমের হৃদয়ের রোদনবেদন, বিকারগ্রস্তের প্রলাপ নহে।

হে প্রেরিত পুরুষ প্রবর আশীর্ব্বাদ করুন! মহা মনস্বী সাধু তপস্বী-গণ প্রার্থনা করুন!—অবগতির গতি পতিত পাবনের কৃপায় এ অধঃপতিত আলস্যাতুর মোস্লেমগণ, পুনশ্চ মাভৈঃ মাভৈঃ নিনাদে জাগরিত হউক!

সম্পূর্ণ।